রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
ও
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ভূমিকা

যে কারণেই হোক, ভারতীয় বিজ্ঞানের এক উচ্চ মঞ্চে অধ্যাপক বোসের আসন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে, অথচ বহু লোকেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে অস্বীকার করেছেন। কেবল বৃথা গল্পে তিনি মনীষার অপচয় করেছেন তাঁর সম্বন্ধে এই জাতীয় অপবাদ থেকেই গেছে। জীবনীকারের কর্তব্য এরকম ভাবমূর্তি গঠিত হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কিনা তার অনুসন্ধান। যশ ও অপযশ এই দুইয়ের মাঝখানে এক কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ, আসল মানুষটি কিন্তু তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছেন। অবশ্য তিনি আমাদের বড় কাছাকাছি সময়ের মানুষ। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সে দূরত্বটা খুবই অল্প। তবু আমরা পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় তাঁকে যতটা সম্ভব দেখাবার চেষ্টা করেছি। সে সময়ে ভারতে দ্রুত পদক্ষেপে বিজ্ঞানের প্রসারণ ঘটেছে, এবং অনিবার্যভাবেই অন্য অনেকে সেই দৃশ্যপটে এসে পড়েছেন। আমরা জানি, এ প্রচেষ্টা কত কঠিন, কারণ বোসের চরিত্র খুব সহজবোধ্য ছিল না। তাঁর জীবনীর সমস্ত উপাদান সংগ্রহ ও ঝাড়া-বাছা করা বহু সময়, শ্রম ও গবেষণা সাপেক্ষ। তাছাড়া তাঁর কোন রেকর্ড, চিঠি বা ডায়েরী রাখার অভ্যাস না থাকায় এই চেষ্টা কঠিনতর আকার নিয়েছে। এই কারণেই অনেক তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় নি।

এই বই লেখার সময় এতজন স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন যে তাঁদের সকলের নাম করে ধন্যবাদ দেওয়া অসম্ভব। তবে

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীমতী উষাবতী বোস, সত্যেন্দ্রনাথের ভাগিনেয় শ্রীভক্তপ্রসাদ মিত্র এবং বোস পরিবারের অন্যান্য লোকেদের কাছে। তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বোস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক তারিণী ভদ্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শিবব্রত ভট্টাচার্যকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদের ধন্যবাদার্হ—তাঁর বাংলায় লেখা সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী থেকে আমরা বহু উপাদান সংগ্রহ করেছি।

অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় সযত্নে সমস্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখে দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের যে সব বন্ধু ও সহকর্মীরা কিছু কিছু অধ্যায় পড়ে মতামত দিয়েছেন তাঁদেরও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানালাম। প্রচ্ছদের ছবিটি বন্ধুবর শ্রীসুনীল ব্যানার্জির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

162/148 লেক গার্ডেনস
কলকাতা-700 045

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

1. পটভূমি

এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে পদার্থবিজ্ঞানে চিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর ঘটে যায়। যেসব মৌলিক আবিষ্কারগুলি এই পরিবর্তন সূচিত করে তার একটি আসে এক অপরিচিত ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে। ইনিই সত্যেন্দ্রনাথ বোস। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বের বিজ্ঞানচর্চার সক্রিয় কেন্দ্রগুলি থেকে বহু দূরে থেকেও তিনি পদার্থবিজ্ঞানের সদ্যোজাত এবং আধুনিকতম ধারণাগুলির গ্রাহক ও পরিপূরক হতে পেরেছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মানসিকতা ও মননশক্তি ছিল সাধারণের থেকে অনেক উচ্চ স্তরের।

সত্যেন্দ্রনাথের অবদানকে কি হিসেবে অসাধারণের পর্যায়ভুক্ত করা চলে এ প্রশ্ন মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্য সূচীভুক্ত হয়ে যায়। এই বিষয়ে অধ্যাপক পি· কে· কবীরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: [1]

"পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক সমস্যার সমাধানে বোসের প্রবন্ধ তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা এমন একটি বিষয়ের আদি সমাধান সম্ভব হল যার চিন্তার ও ব্যাখ্যার ফলে অন্তত তিনটি নোবেল পুরস্কার অর্জিত হয়েছে। খুবই ক্ষোভের বিষয় এই সম্মান সত্যেন্দ্রনাথ

বোসকে দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞানে ভারতীয়দের যা অবদান তার মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর কাজের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।"

অধ্যাপক এম· জি· কে· মেনন এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেছেনঃ[2]

"ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আমি নিজে কখনই বুঝতে পারিনি সত্যেন বোসকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়ার হেতু কি। এ-বিষয়ে আমি অনেক স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের সংগে আলোচনা করে দেখেছি তাঁরাও একই মত পোষণ করেন। তবে দশক বা শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে কোনো বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেলেন কি না পেলেন সেটা তত বড় কথা নয় তার চেয়েও বড় কথা হল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে কি না, তাঁর অবদান সর্বদাই পঠিত, আলোচিত এবং ব্যবহৃত হবে কি না। এই শেষের শ্রেণীতে সত্যেন বোসকে ফেলা যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান ও বোসন কণার নাম কোনদিন লুপ্ত হবার নয়।"

আজকের ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের পক্ষে বোস এবং তাঁর সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানচর্চার অনুন্নত পরিবেশ কল্পনা করাও কঠিন। ভারতে তখন আধুনিক বিজ্ঞান সদ্য আকার ও অবয়ব লাভ করছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই যুগই আবার ভারতীয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও এই সময়ে সাহা, রামন, মহলানবিশ ও অন্যান্য কৃতী বিজ্ঞানীর উদয় হয়েছিল যাঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

এইসব নতুন পথের দিশারীদের কাজের মূল্যায়ন করতে গেলে প্রথমে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে তাঁদের পটভূমি কেমন

ছিল; কল্পনা করতে হবে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা এবং যে পরিবেশে ভারতীয় ভূমিতে নব-বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল সেই সম্মিলিত পশ্চাদ্‌পটের রূপ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতীয়দের যে বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এ তথ্য সর্বজনস্বীকৃত। পদার্থের উদ্ভব ও উপাদান সম্বন্ধে তাঁদের কিছু কিছু অনুমান আধুনিক মতবাদের প্রায় কাছাকাছি আসে। এর মধ্যে আছে কপিল, কণাদ এবং পরে জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের পদার্থ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তগুলি। সেই সময়ে বিজ্ঞান ছিল দর্শনের অঙ্গীভূত এবং এইসব বিষয়ে যাঁরা চিন্তা করতেন তাঁদের হয়ত অনুমানগুলি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করার কোনো উপায়ই ছিল না। তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি সেই কারণেই আরো আশ্চর্য বলে বোধ হয়। পাশ্চাত্য জগতেও কেবলমাত্র গ্যালিলিওর পর থেকেই বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আধুনিক হল, কারণ তিনিই প্রথম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বলেন কোন প্রামাণ্য উক্তিতে, বিশেষ করে আরিস্ততলের উক্তিতে আস্থা রাখা সমীচীন নয়। এই মনোভাবই প্রকৃত বিজ্ঞানীর লক্ষণ।

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা, শল্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি ফলিত বিজ্ঞানের কিছু কিছু শাখার বেশ উন্নতি হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশী আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে বিজ্ঞানচর্চার অবনতি ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার অধোগতির সূত্রপাত। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে এর যোগ প্রত্যক্ষ, কারণ, বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ছিল। ইউরোপে যখন জ্ঞানবিজ্ঞানের নব-জাগরণ হল এদেশে তার কোন প্রভাবই পড়ল না। তখন ভারতে চলছে ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়। এই

অন্ধকার যুগ চলেছে ইংরেজদের আগমন ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা অবধি। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নব-জাগরণ হয় তখন থেকেই এদেশে নব্য বিজ্ঞানের প্রকৃত জন্ম হল বলা চলে।

অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন বিজ্ঞানের প্রগতির সংগে ইতিহাসেব ঘটনাবলীর অংগাংগী সম্পর্ক। বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উপর ইতিহাসের প্রভাব স্পষ্টই সক্রিয়। কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতে বিজ্ঞানের সূচনাকে ত্বরান্বিত করেছে এটা সহজেই বলা চলে।

এই দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে যেসব ব্রিটিশদের আগমন হয় তাদের উন্নততর কারিগরী শৈলী জানা ছিল, তাই তারা অবিলম্বে বুঝতে পারে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। তাদেরই উদ্যমে ইংলণ্ড থেকে বিশেষজ্ঞদের আনানো হয় এই সম্পদের সন্ধান ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য। এইসব বিশেষজ্ঞ এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমদানী করলেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় ট্রিগনোমেট্রিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড বটানিকাল সার্ভে, মাইনিং ফেডারেশন, জিওগ্রাফিকাল সার্ভে, প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার অফ কমার্স ইত্যাদি। ইংরেজ বণিক-শাসকদের মনে অবশ্য স্বার্থ চিন্তাই প্রবল ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য যাই থাক তাদেরই উদ্যমে রানীগঞ্জে কয়লা, আসাম ও ব্রহ্মদেশে খনিজ তেল, মহীশূরে স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ আবিষ্কার ও উত্তোলন সম্ভব হল। নিজেদেরই প্রয়োজনে তারা এদেশে রেলপথের পত্তন করেন। ল্যাম্বটন, এভারেস্ট, ভয়েসি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই সব কাজের সূত্রে এদেশে আসেন কিন্তু তাঁদের কাজ ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। ভারতীয়দের বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডে

তখনো প্রবেশ নিষেধ ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কোনরকম বাসনাই ছিল না। উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই তারা গ্রহণ করেনি। ভারতীয়দের ইচ্ছাকৃতভাবে এইসব কাজ থেকে দূরে রাখা হত। তাছাড়া ভারতীয়দের তরফ থেকেও তখন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন তাগিদ দেখা যায়নি। এইসব কারণে এ-দেশে নববিজ্ঞানের সূচনা হতে ক্রমশ দেরি হতে লাগল।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যদি কোন একজন ভারতীয়ের ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য করা যায় তবে তিনি রাজা রামমোহন রায়। অসাধারণ দূরদৃষ্টি বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের পক্ষে বাঁচার পথ একটাই সে পথ পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে রাজা এবং ঠাকুর পরিবারের লোকেরা নিজেদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তখনো বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক। রামমোহন তৎকালীন গভর্নর জেনারেলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। 1781 সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। 1792 সালে জোনাথান ডানকানের চেষ্টায় একটি কলেজ খোলা হয় বারানসীতে। দক্ষিণ ভারতে লুথেরিয়ান মিশনারীরা এবং শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্য ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা সুরু করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বিস্তৃততর করেন রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। 1816 খ্রীস্টাব্দে তাঁরা কলকাতায় যে কলেজের পত্তন করেন পরবর্তী কালে তা হিন্দু কলেজ এবং 1855 সালের পর প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে

পরিচিত হয়। খ্রীস্টান মিশনারীরা 1818 সালে শ্রীরামপুরে একটি মিশনারী কলেজ স্থাপন করেন। মিশনারীদের চেষ্টাতেই বোম্বাইতে 1834 সালে স্থাপিত হয় উইলসন স্কুল এবং 1837 সালে মাদ্রাজে মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে হতে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি হয়ে যায়। বিখ্যাত উড্‌স্‌ ডেসপ্যাচের দ্বারা 1857 সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নিল। অবশেষে রাজা রামমোহনের স্বপ্ন সার্থক হল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা একেবারেই বিজ্ঞান-মুখী ছিল না। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েই ছিল এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ। ভারতীয়দের মধ্যে যখন ক্রমশ এই চেতনা জাগলো যে আধুনিক বিজ্ঞানকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তখনই কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনে বাধ্য হলেন। তবে এদেশের প্রথম গবেষণা প্রতিষ্ঠান—ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স কিন্তু সরকারী আনুকূল্য ছাড়াই গড়ে ওঠে। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় 1876 সালে, প্রতিষ্ঠা করেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঃ[3]

"আমরা একটি প্রতিষ্ঠান চাই যার মধ্যে থাকবে রয়্যাল ইনস্টি-টিউশন অফ লন্ডন এবং ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাড-ভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের চরিত্র, লক্ষ্য ও কার্যসূচী। আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যা হবে প্রকৃত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, যেখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতাদি দেওয়া হবে। সেখানে কেবল যে বক্তারা পরীক্ষা দ্বারা তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ করবেন তাই নয়, শ্রোতাদেরও অনুরূপ পরীক্ষা করার জন্য

আহ্বান জানানো হবে। আমাদের বাসনা এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে এতদ্দেশীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হোক।”

সেই আমলে যা কিছু উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কাজ সবই চালানো হত সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরে। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ট্রিগনোমেট্রিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যা স্থাপিত হয় 1818 খ্রীস্টাব্দে। 1850 সালে স্থাপিত জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং 1864 সালে স্থাপিত মিটিওরলজিকাল অফিসেও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ চলত। তবে এইসব প্রচেষ্টাই ছিল বিদেশী সরকারের সুবিধার এবং তাঁদের কাজে ব্যবহারের জন্য। এর সংগে কোনভাবেই ভারতীয়দের কল্যাণ বা স্বার্থ জড়িত ছিল না।

সেই যুগে, যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে অধিকাংশ ভারতীয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট, তখন ডাক্তার সরকার বুঝতে পারেন তাঁর দেশবাসীকে প্রগতির সংগে তাল রেখে চলতে হবে, পিছিয়ে পড়লে চলবে না। ডাক্তার সরকার নিজেও এইসব আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথিতযশা চিকিৎসক, প্রচুর অর্থও উপার্জন করতেন। কিন্তু তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ যথেষ্ট ছিল না, তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন। বিজয়নগরমের মহারাজা তাঁর চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ তিনি একটি ল্যাবরেটরী তৈরির টাকা দান করেন। এই সময়ে উদয় হলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন দিকপাল—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এবং শ্রীনিবাস রামানুজন। এই তিনজনের মিলিত কাজের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হল। এ‘দের মধ্যে দু’জন ছিলেন সমসাময়িক—জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রের জন্ম 1859 সালে, প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম তার দুই বছর পরে।

রামানুজনের জন্ম হয় তারও ছাব্বিশ বছর বাদে, 1887 সালে। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। জগদীশচন্দ্র ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি এদেশে পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। তার আগে ভারতে পরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের কোন ঐতিহ্যই ছিল না। তাঁকে যুক্তিসংগতভাবেই ভারতের গ্যালিলিও আখ্যা দেওয়া যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রসায়নবিদ এবং সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী, তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর সারা জীবন বিজ্ঞান ও দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত ছিল। তাঁর লেখা "হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি" (হিন্দু রসায়নের ইতিহাস) পড়ে বোঝা যায় ভারতে ক্রমশ নিজেদের দেশের বৈজ্ঞানিক অতীত সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছে।

শ্রীনিবাস রামানুজন দক্ষিণ ভারতের এক গন্ডগ্রামে এক অশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর গাণিতিক প্রতিভা ছিল জন্মগত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞরাও তাঁর প্রতিভায় চমৎকৃত হতেন। এই ব্যাপারটির রহস্য বোঝা খুব কঠিন। তবে এটুকু বলা চলে মানুষের উপর তার সমসাময়িক কালের প্রভাব ক্রিয়া করে। এছাড়া অন্যভাবে এই গ্রাম্য বালকের অসাধারণ গণিতশাস্ত্র জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। অতি আধুনিক গাণিতিক মতবাদগুলি তিনি জানলেন কিভাবে? দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি অল্প বয়সে মারা যাওয়ার ফলে জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের মত ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলার সুযোগ পান নি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ভারতীয় বিজ্ঞান প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। দেরীতে হলেও এতদিনে প্রকৃতপক্ষে এ-দেশে বিজ্ঞানের নব-জাগরণ আরম্ভ হল। জমি প্রস্তুত হচ্ছিল। ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা এই নব-জাগরণ ত্বরান্বিত করল। এ-

কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হলেও ব্রিটিশরাই এই ব্যাপারটির জন্য অনেকাংশে দায়ী। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 1913 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম আরম্ভ হল। জমি প্রস্তুত ছিল, তাই ফসল ফলতে বিলম্ব হল না। এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই ভারতে তিনটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল। সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব, বোস পরিসংখ্যান এবং রামন প্রভাব। মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস এবং চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনকে বাদ দিলেও অন্যান্য অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী এই সময় বিশ্বের বিজ্ঞানজগতে পরিচিতি লাভ করেন—তাঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর, বীরবল সাহনী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। যখন 1930 সালে রামন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন ভারতীয় বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হল। কিন্তু এই সময়টা ছিল ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও মনীষা সেই দিকে ধাবিত হল। বিজ্ঞানের বিস্তৃততর পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হল 1947 সাল অবধি।

এই পর্যন্ত এসে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান চর্চার ধারা যে পথে চলেছে সেই দিকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রগতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বার্নেল[4] তিনটি পর্যায়ে বিভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম পর্যায়কে বলা যায় রোমান্টিক যুগ বা ব্যক্তি প্রাধান্যের যুগ। এই যুগে রয়েন্টগেন, বেকেরেল, কুরী, রাদারফোর্ড, আইনস্টাইন প্রভৃতি ব্যক্তিকে ঘিরে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ ঘটেছে। এইসব বিজ্ঞানীদের নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সেই যুগে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাব ছিল। পেশা হিসেবে বিজ্ঞান

মোটেই অর্থকরী ছিল না। সত্যের অনুসন্ধান করার বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়া বিজ্ঞানকর্মীর আর কিছুই পাওয়ার ছিল না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎচমকের মত তাঁদের মনে এক-একটা নতুন ধারণার উদয় হত এবং এইভাবেই হত নতুন আবিষ্কারের সূচনা। অবশ্য বিজ্ঞানের এই পর্যায় খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বেধে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। প্রতিরক্ষার কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনার কথা যুদ্ধরত দেশগুলির সরকার বুঝতে পারলেন ফলে সাধারণভাবে বিজ্ঞান গবেষণার উপর এর গভীর প্রভাব দেখা গেল। সরকারী উদ্যম ও আনুকূল্যে বিজ্ঞানের দিক পরিবর্তিত হল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছেড়ে সহসা আরম্ভ হল বিশাল বিশাল সরকারী অর্থপুষ্ট উদ্যোগ। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে বর্ষিত হতে লাগল সরকারী আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্য, কারণ তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বুনিয়াদ পাকা না হলে ফলিত বিজ্ঞান অথবা প্রয়োগধর্মী গবেষণা বেশি এগোতে পারে না। দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের অশুভ পরিণতি যতই হয়ে থাক তাদের দ্বারা বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার গতি ত্বরান্বিত হয়ে এমন অবস্থায় পেৌঁছল স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে পেৌঁছতে হয়ত বহুদিন লেগে যেত।

বিজ্ঞানচর্চার এই দ্বিতীয় পর্যায়েরই স্বাভাবিক পরিণতি তৃতীয় পর্যায় যা এখনো অব্যাহত আছে। অবশ্য এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা বেশি পরিমাণে মানুষের কল্যাণসাধনে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে গবেষণার গতি প্রকৃতিতে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। এখন গবেষণার যন্ত্রপাতি আগের থেকে অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম এবং সেগুলি এত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা কেনা সাধ্যাতীত। আধুনিক গবেষণায় দলগত কাজই প্রাধান্য লাভ করেছে, এতে সাফল্য অনেকাংশে প্রত্যেকের কাজের

সামঞ্জস্য সাধনের উপর নির্ভরশীল। গবেষণার সেই আদি যুগ থেকে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছি। সেই যুগে বিজ্ঞানীর সম্বল হিসেবে নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরও গবেষণার জন্য প্রয়োজন বিশাল এবং বহুমূল্য যন্ত্রগণক। আজকাল যন্ত্রপাতির গুরুত্ব অনেক বেশি। তাছাড়া এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের সম্মান ও আর্থিক কৌলিন্য বৃদ্ধি।

এখন ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বিজ্ঞানের যে যুগকে রোমান্টিক যুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে সেই পর্ব অব্যাহত ছিল বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক অবধি। এতদিন পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞানীরা যা কিছু করেছেন সবই নিজেদের চেষ্টায়। শিল্পক্ষেত্র বা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্যই তাঁরা পান নি। স্বাধীনতার পর এক বিরাট পরিকল্পনার খসড়া করা হল। জাতীয় বিজ্ঞান নীতিও নির্ধারিত হল। যেহেতু আমাদের দেশে আধুনিকীকরণ অনেক বিলম্বে সুরু হয়েছে তাই অন্য দেশের সঙ্গে তাল রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন হল দ্রুত পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যাওয়ার। তবে আমাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলির তেমন সুস্পষ্ট কোন সীমানা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনী ও কর্মজীবন থেকে পরে আমরা দেখতে পাব যে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই বিজ্ঞানের রোমান্টিক পর্বের।

1950 সালে পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি। এই কমিটি এক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। নবগঠিত জাতীয় সরকার এই খসড়ায় যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল সেগুলি কাজে রূপায়িত করতে উদ্যোগী হন। প্রাথমিক,

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর—সব পর্যায়েই পাঠ্য-সূচীর আমূল পরিবর্তন আনা হল। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হল, গবেষণার জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ হল। কয়েকটি জাতীয় গবেষণাগার ও ল্যাবরেটরীও প্রতিষ্ঠিত হল।

তারপরে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন বিজ্ঞানচর্চার যে ধারা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি এইভাবে তার বিন্যাস করা চলে:

(*i*) আমরা কয়েকটি বিশাল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে অবতীর্ণ হয়েছি—

(*ii*) এই উদ্যোগগুলি প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ, কাজেই এগুলি সরকারী উদ্যোগ;

(*iii*) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও বেড়েছে।

চিত্রটি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। তবে আমাদের সামনে যে দুস্তর বাধা এখনো রয়েছে তা হল প্রযুক্তিবিদ্যায় অনগ্রসরতা। ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে প্রযুক্তিবিজ্ঞান তাল রাখতে পারেনি অথচ আজকাল এ দুটির সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে একটিকে বাদ দিলে অন্যটির বিকাশ ব্যাহত হয়। প্রযুক্তিবিদ্যায় গত পঁচিশ বছরে আমাদের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতেও মোটামুটি তিনটি পর্যায় স্পষ্ট:

(*i*) বিদেশী যন্ত্র ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে শিল্প স্থাপন, দেশে কারিগরী শিক্ষণ এবং এই শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠানো;

(*ii*) বিদেশী যন্ত্রের সাহায্যে দেশে যন্ত্র নির্মাণ;

(*iii*) সমস্ত বিদেশী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানী বন্ধ করে দেশেই যাবতীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা।

পর্যায়গুলি যদিও খুব স্পষ্টভাবে অনুসৃত হয়নি তবু মোটামুটি-ভাবে বলা যায় আমরা এখন তৃতীয় পর্যায়ের সূচনায় এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এই শতাব্দীর আরম্ভের ঠিক আগে, যখন সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম হয় তখন না ছিল আমাদের কোন বিজ্ঞান নীতি, না ছিল কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞান কার্যক্রম।

2. বাল্য ও কৈশোর (1894—1914)

কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে 1894 সালের পয়লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই ইংরেজী শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং দুজনেই সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। কাজের জন্যই তাঁদের দেশ ছাড়তে হয়। তাঁদের দেশ ছিল নদীয়া জেলার বড় জাগুলী গ্রাম, কলকাতা থেকে 48 কিলোমিটার দূরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক নগরী হিসেবে কলকাতা আত্মপ্রকাশ করে। তার আগে নদীয়া ছিল বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এই অঞ্চলের পণ্ডিতদের খ্যাতি সারা ভারতে বিস্তৃত ছিল। ভদ্র ব্যবহার এবং ভাষা মাধুর্যের জন্যও এই অঞ্চল সুবিদিত। নদীয়ার ব্যবহৃত বাংলাই ক্রমে সর্বব্যবহার্য ভাষারূপে স্বীকৃত হয়। এখন বাংলা ভাষার যে চলিত রূপ সর্বত্র দেখা যায় তা নদীয়ারই আঞ্চলিক ভাষা। উনিশ শতকে বড় জাগুলী ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখনও সেখানে প্রাচীন মন্দির ও বাড়িঘরের চিহ্ন পাওয়া যায়।

বৃটিশ সরকারের শাসনকার্য চালাবার অঙ্গ হিসেবে অনেক নতুন নতুন চাকরীর উদ্ভব হল। ফলে গ্রাম থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর শহরে আসার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। বোস পরিবারেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কায়স্থদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষায়

আগ্রহ বেশি পরিমাণে দেখা দেয় এবং ক্রমে এঁরাই সব গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীগুলি অধিকার করে নিতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অম্বিকাচরণ সরকারী সূত্রে বহু দূরদেশে যেতেন। তিনি যখন মীরাটে (উত্তর প্রদেশ) অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করছিলেন তখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়িতে খবর পাঠান হল। কিন্তু পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (সত্যেন্দ্রনাথের পিতা) এসে পেঁছবার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অম্বিকাচরণের পরিবার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। সুরেন্দ্রনাথের তখনো স্কুলের পড়া শেষ হয়নি, কিন্তু এখন তাঁকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় লাগতে হল। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছোট ভাই দুজনেই তখন ছোট। তাঁদের তখন বড়ই দুঃসময় গেছে। কলকাতায় ঈশ্বর মিল লেনে অবশ্য তাঁদের নিজেদের বাড়ি ছিল, অম্বিকাচরণের পিতা এই বাড়ি তৈরি করেন—কিন্তু বাড়িতে ভাড়াটে থাকায় তাঁরা জোড়াবাগানে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হন। যখন সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয় তখনও তাঁরা যথেষ্ট অর্থকষ্টে কাল যাপন করছেন।

সুরেন্দ্রনাথের উদ্যম ছিল এবং উচ্চাশাও ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ শিখে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যোগ দিলেন। কাজ উপলক্ষ্যে তাঁকে আসাম ও উত্তরবঙ্গে থাকতে হত। সারা ব্রীজ নির্মাণ কার্যের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। আলিপুরের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা আমোদিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রায়চৌধুরীরা ছিলেন গাইহাটির জমিদার। তাঁরা ছিলেন সংস্কৃতিবান পরিবার, বাড়িতে সাহিত্য ও সঙ্গীতেরও চর্চা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু ছিলেন মতিলালের বন্ধু। তাঁর এক পৌত্র অনিল

রায়চৌধুরীর সেতারবাদকরূপে যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

সুরেন্দ্রনাথের মানসিকতা বুঝতে গেলে তাঁর যুগকে একটু বোঝা দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে এক নবজাগরণের যুগ। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তখন—জাতি তখন সদ্য আধুনিক যুগের আস্বাদ লাভ করেছে। এই পরিবর্তন অবশ্য সহসা আসেনি—অনেকগুলি ঘটনা এর জন্য দায়ী। ঘটনাগুলি হল বৃটিশ শাসনের প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, এক নব অর্থনীতির উদ্ভব যার ফলে এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম। এই সম্প্রদায় ছিল নতুন যুগের নতুন হাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। এইসব সচেতনতার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হল—জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধল এবং জাতীয় আন্দোলন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের স্বদেশী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—যাকে বলা যেতে পারে নবচেতনা। হিন্দু-মেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রবণতার মাধ্যমে এই চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রবণতা ক্রমে প্রসারিত হতে হতে 1896 সালের শিল্প মেলাতে এক নতুন পর্যায়ের পরিণতি লাভ করে। স্বদেশী দোকান খোলা হল ও স্বদেশী জিনিস কেনার জন্য প্ররোচনা দেওয়া আরম্ভ হল।[5]

সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছোট হলেও এই সংস্থা প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস-এর সঙ্গে প্রায় একই সময়ে উৎপাদন আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে বই পড়তেন, তার মধ্যে মার্কস এবং এঙ্গেলসও ছিল। তাঁর

মন ছিল সহৃদয় এবং উদারচেতা। নতুন ভাবধারা গ্রহণে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। আদর্শবাদী এবং ন্যায়-নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তিনি —সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন তাঁর কালের প্রতিভূ।

ততদিনে এক নতুন নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক নগর-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। শহরের স্কুল-কলেজে শিক্ষিত তরুণেরা বড় হয়ে উঠেছে, ভাবে ও চিন্তাধারায় যারা সম্পূর্ণরূপে শহুরে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই কালেরই মানুষ।

ছোটবেলায় শহরে এবং শহুরে মানসিকতার মধ্যে কাটাবার ফল তাঁর চরিত্রগঠনে বেশ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কলকাতাবাসীদের চরিত্রে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার প্রায় সবই সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ভালভাবেই প্রকট।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল জন্মগত। হয়ত যে কোন পরিস্থিতিই তার বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পারত না। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বাড়ির আবহাওয়া প্রতিভা বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। ছোট-বেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গুদামঘরের সিমেন্টের মেঝের ওপর অঙ্ক দিয়ে যেতেন। বালক সত্যেন মহা আনন্দে অঙ্ক কষে যেত। এটা তার কাছে বেশ খেলার মতো ছিল, এবং তাঁর বাবাও এইভাবে কৌশল করে ছেলের দুষ্টুমী বন্ধ রাখতেন। ছয় কন্যার মধ্যে একমাত্র পুত্র বলে সত্যেন ছিল বাড়ির সকলের নয়নের মণি। বাড়িতে এ-ছাড়াও আরো আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাই ও তাঁদের পরিবারবর্গ ছিলেন। আর ছিলেন তাঁর চার বোন।

পাঁচ বছর বয়সে সত্যেনের স্কুলের পাঠ আরম্ভ হয়। জোড়া-বাগানের বাড়ির কাছে নর্মাল স্কুল—সেখানে প্রথমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। এই নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন পড়েছিলেন।

পরে যখন তাঁরা গোয়াবাগানে নিজেদের বাড়িতে চলে যান তখন তাঁকে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়, কারণ সেটা ছিল বাড়ির কাছে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষুদিরাম বসুর শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ভাবধারার প্রবর্তক হিসেবে বেশ সুনাম ছিল। তবে সুরেন্দ্রনাথ চাইলেন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে পুত্রের প্রতিভা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠুক। তাই স্কুলের শেষ বছরে তাঁকে ঐতিহ্য-মণ্ডিত হিন্দু স্কুলে ভর্তি করা হল।

হিন্দু স্কুলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ফিরে যেতে হবে 1817 সালে, যখন ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহনের মিলিত চেষ্টায় ভারতীয়দের শিক্ষা আন্দোলন জোরদার হয় ও হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষার জন্যে ভারতে এটাই প্রাচীনতম কলেজ।

হিন্দু কলেজের সাফল্য এটাই প্রমাণ করল যে জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার দাবী ক্রমশ বিস্তৃত ও প্রবল হয়ে উঠেছে। সরকারী শিক্ষানীতি প্রণয়নেও এর অবদান অনেক, কেননা এত-দিন পর্যন্ত সরকার ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে কিছুই করেননি।

1853 সালে সরকার হিন্দু কলেজের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে তুলে নেন। কলেজের উচ্চতর বিভাগটির নতুন নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ। নিম্ন বিভাগটি হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হয়।[৩]

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুল দুটিই ছিল স্কুল হিসেবে উৎকৃষ্ট। যখন সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুলের ছাত্র তখন প্রতিদ্বন্দ্বী হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ঈশান ঘোষ—পালি পণ্ডিত হিসেবে তিনি ছিলেন সুবিদিত। হেয়ার স্কুলের ছেলেদের গর্বের বস্তু ছিলেন তিনি। সেই সময় হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসময় মিত্র, তাঁর পাণ্ডিত্য ঈশান ঘোষের মতো

না হলেও শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ এবং একনিষ্ঠ। ছাত্রদের পড়ার জন্য তিনি ইংরেজী, ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদের একখানি বই লেখেন। উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়াও হিন্দু স্কুলে ছাত্রদের মনে অনুপ্রেরণা জাগাবার জন্য ভাল শিক্ষকও যথেষ্ট ছিলেন। বাংলার শিক্ষক শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসার বোধ উদ্বুদ্ধ করেন। ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ স্কুলের উচ্চতম ক্লাসটিতে ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় ছিল ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও সংস্কৃত। তাঁদের পড়তে হত গৌরীশংকর দে-র অঙ্ক ও বীজগণিত, হল অ্যান্ড স্টিভেন্স্-এর জ্যামিতি, ডাডলে স্ট্যাম্পের বিশ্বভূগোল, অধর চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের ইতিহাস, রো অ্যান্ড ওয়েব-এর গ্রামার ইত্যাদি বই। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংকলন। অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে ছিল কিপলিং-এর জাঙ্গল স্টোরিস, বাংলায় বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, কাদম্বরী ও যোগেন বসুর লেখা মাইকেল মধুসূদনের জীবনী।

ছোটবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি প্রচুর বই পড়তেন। তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁর স্কুলের সহপাঠী ও বন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের মুখে জেনেছি যে তিনি ইন মেমোরিয়াম কবিতাটি আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। কালিদাসের মেঘদূতও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

হিন্দু স্কুলের অঙ্ক শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সীর নাম প্রায় কিংবদন্তীর আকার ধারণ করেছে। তিনি প্রথম দেখেই বুঝতে পারেন সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা আছে। একবার পরীক্ষায় তিনি সত্যেনকে 100 নম্বরের মধ্যে 110 দেন, কারণ তিনি সবগুলো অঙ্কই

করেছিলেন, যেগুলি করা আবশ্যিক ছিলনা সেগুলিও করেছিলেন। বক্সী অহংকার করে বলতেন সত্যেন একদিন লাপ্লাস বা কশির মত বিরাট গণিতজ্ঞ হবে।

যিনি ভাল শিক্ষক তিনি সহজেই প্রতিভার লক্ষণ ধরতে পারেন। বক্সী এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে এই বালকটির অঙ্কের প্রতিভা সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে। পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলে সত্যেন অন্যান্য যা অঙ্ক বই জোগাড় করতে পারতেন সেগুলির সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলতেন, তাছাড়া একটি অঙ্ক তিনি কষতেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ভবিষ্যতে তাঁর যে আশ্চর্য গাণিতিক প্রতিভা সকলকে চমৎকৃত করবে এই সময়েই তা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। 1908 সালে তাঁর এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ঠিক দু'দিন আগে তিনি পানবসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। ফলে এক বছর নষ্ট হল। আর এক বছর তাঁকে হিন্দু স্কুলে থাকতে হল। এই সময়টা তিনি উচ্চতর গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেন।

1909 সালের এনট্রেন্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান পেলেন। যে ছেলেটি প্রথম হয় তার নাম চন্ডীদাস ভট্টাচার্য—সেও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। তবে ছেলেটি পরের বছর মারা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইতিহাস ও ভূগোলে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও তিনি কলেজে বিজ্ঞান পড়াই স্থির করে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইনটারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে ভর্তি হলেন।

1909 সালটি বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে। তাঁর আত্মজীবনীতে প্রফুল্লচন্দ্র এই কথার উল্লেখ করে লিখেছেনঃ

'সেই স্মরণীয় বছরে এমন একদল মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী

কলেজে ভর্তি হয় যারা ভবিষ্যতে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল।[7]

এদের মধ্যে তীক্ষ্ণতম মেধার অধিকারী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। যে ছাত্রগোষ্ঠীর কথা প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন তাঁদের মধ্যে আরো ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার, মাণিকলাল দে, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অমরেশ চক্রবর্তী। দুইবছর পরে মেঘনাদ সাহা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে এমন উজ্জ্বল তারকার সমন্বয় আর ঘটেনি—এঁদের মিলিত পরীক্ষার ফল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই গোষ্ঠীর থেকে কয়েক বছর উপরের ক্লাসে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নীলরতন ধর, শিশিরকুমার মিত্র প্রভৃতি। এঁরা শুধু যে গবেষণার মান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাই নয়, পরে যখন ভারতে বিজ্ঞান নীতি ও গবেষণার ধারা নির্ধারিত হয় সেই সব গঠনমূলক কাজে এঁদের প্রায় সকলেরই প্রত্যক্ষ অবদান ছিল।

পড়াশোনার ক্ষেত্র বাদ দিলেও কিন্তু এই গোষ্ঠী কয়েকটি আদর্শ-গত ব্যাপারে ছিল সমর্পিতপ্রাণ ও একাত্ম। এঁরা সকলেই ছিলেন একান্তভাবে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এঁদের মধ্যে অনেকেরই বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। কয়েক-জনের যোগাযোগ ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

1905 সাল, যে বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ প্রকাশিত হয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি উল্লেখযোগ্য বছর। সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো, তখনো তিনি স্কুলের ছাত্র। সেই সময় লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ হবে ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক আন্দোলন তখন বঙ্গদেশে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে

কার্জনের মত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে সেটা সহ্য সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি এই আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য এক চমৎকার কৌশল অবলম্বন করলেন। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিল জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করা। কিছুদিন যাবৎ শাসন কাজের সুবিধের জন্য বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার কথা ভাবা হচ্ছিল। কার্জন কংগ্রেস এবং কলকাতার নেতৃবৃন্দকে এক বিবেচনা করলেন। তাঁর মতে এই নগরই ছিল যত রাজবিরোধী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। বাংলাভাষীদের দুভাগ করে দিলে জাতীয় আন্দোলনে বাঙালীদের প্রভাব বহুলাংশে খর্ব হবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগকে বাংলা থেকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি হবে। এই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা। জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি বঙ্গদেশকে দুখণ্ড করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু এর ফলে চাপা অসন্তোষ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শিক্ষিত বাঙালীরা প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলেন। নতুন করে জাতীয়তা-বাদের প্রবাহ দেশকে ভাসিয়ে দিল। এইরকম আদর্শবাদ ও আবেগদীপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িকরা কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন, 'তরুণ সত্যেনের জীবন যখন গঠিত হচ্ছে সেই সময় তাঁর উপরে সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল স্বদেশী আন্দোলন।'[৪] রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের লোকেরা এই আন্দোলনকে একটা অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাখীবন্ধনের দিনটি উদ্‌যাপিত হত চিত্তশুদ্ধির দিন রূপে। সেদিন সকলের বাড়ি অরন্ধন, মোড়ে মোড়ে বিদেশী কাপড় জ্বালিয়ে বহ্যুৎসব হত। প্রত্যেক বাড়ি থেকে

বিদেশী জিনিস, বিশেষ করে কাপড় নিয়ে আসা হত—সত্যেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক ছেলেরা মহা আনন্দে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করতেন ও উনুনে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিতেন। এটা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল অনেকটা ধর্মীয়। বৃটিশদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে এইসব অনুষ্ঠান করা হত তা ঠিক নয়, এগুলি করা হত কর্তব্য হিসেবে, ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। বৃটিশ জিনিস বয়কট সুরু হল পুরো দমে। ঠিক সেই সময় আবার তরুণদের স্বাধীনতার জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি দেবার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। অনুশীলন সমিতি ছিল এইরকম একটি সমিতি। এরা শেখাত শরীর চর্চা এবং অস্ত্রচালনা। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু জীবনতারা হালদার এইসব গুপ্ত সমিতির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এইরকম একটি সমিতি পরিচালিত নৈশ স্কুলে পড়াতেন। স্কুলটির নাম ছিল ওয়ার্কিং মেনস ইনস্টিটিউট—এখানে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান করা হত। মানিকতলা স্ট্রীটের কেশব একাডেমীতে ক্লাস বসত। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন অরবিন্দ ও বারীন ঘোষের এক সহকর্মী। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিখ্যাত অঙ্কের অধ্যাপক ডি· এন· মল্লিক ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেন্ট, যদিও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। যেসব ছাত্ররা স্কুলের শিক্ষণকার্য পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, গিরিজাপতি ও পশুপতি ভট্টাচার্য এবং হরিশ সিংহ। এঁদের বি· এসসি পরীক্ষা পর্যন্ত এই ক্লাসগুলি এঁরা নিয়মিতভাবে নিয়ে থাকতেন।

তবে 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথের পরবর্তী

কালের বন্ধু মেঘনাদ সাহা যেভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর কিছু ঘটেনি। মেঘনাদ তখন গ্রামের স্কুল ছেড়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ছেন—একটি স্টাইপেন্ড মাত্র সম্বল, এমন সময় দেশ জুড়ে লেগে গেল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। তখন ইংরেজ গভর্নর সার ব্যামফিল্ড ফুলার স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করল। যারা যারা এই বয়কটে অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই স্কুল থেকে বিতাড়িত হল, তাদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা ও নিখিলরঞ্জন সেন। মেঘনাদের বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে তিনি একটি প্রাইভেট স্কুলে স্থান পেলেন। কোন না কোনভাবে স্বদেশী আন্দোলন ঐ সময়কার প্রত্যেক ছাত্রের জীবনে ছাপ ফেলেছিল। এই ছাপ এতই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে এ'রা প্রায় কেউই সরকারী চাকরীতে যাননি। তার বদলে এ'রা বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে দেশের সেবাই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যেও সেই সময় হয়েছিল উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্কের সমাবেশ। রসায়নে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পদার্থবিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অঙ্কে ছিলেন ডি· এন· মল্লিক, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় ও সি· ই· কালিসের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা, ইংরেজী বিভাগে ছিলেন মনোমোহন ঘোষ (অরবিন্দের দাদা), মিঃ পার্সিভাল ও পি· সি· ঘোষ (শেষোক্ত অধ্যাপক বিখ্যাত হেডমাস্টার ঈশান ঘোষের পুত্র।)

চতুর্থ বিষয় হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ নেন শারীরতত্ত্ব (ফিজিওলজি)। এই বিষয়টি পড়াতেন সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ (প্রশান্ত মহলানবিশের কাকা)। ফাইনাল পরীক্ষায় এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 100 মার্কের মধ্যে 100 পেয়েছিলেন। স্কুল থেকেই সত্যেন ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল

প্রকৃতির। সর্বদাই তাঁর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলত। মেধাবী ছাত্রদের সাধারণত শান্তশিষ্ট বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু সত্যেন ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। শিক্ষকদের ক্লাসে নানাভাবে বিরক্ত করা ছিল তাঁর স্বভাব। অবশ্য এই দুষ্টুমী কখনই ভদ্রতার মাত্রা অতিক্রম করত না বলে শিক্ষকরাও তাঁকে স্নেহ করতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এসেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বুঝতে পারেন ছেলেটি অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। পরের দিন থেকেই তিনি সত্যেনকে গ্যালারি থেকে নেমে এসে তাঁর টেবিলের পাশে একটি টুল পেতে বসতে আজ্ঞা করেন।

ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে সর্বোচ্চ মার্কস পান। অধ্যাপক পার্সিভাল সেই বছরই অবসর নেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের উত্তরপত্রে বাড়তি দশ নম্বর যোগ করে লিখে দেন, ‘এই ছেলেটির মৌলিক চিন্তা করার ক্ষমতা আছে’। তিনি এই খাতা দেখে এতই মুগ্ধ হন যে ইংলণ্ড চলে যাবার আগে সত্যেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ছিল, সেজন্য তিনি খেলাধূলায় খুব সক্রিয় অংশ নিতে পারতেন না। কোনরকম খেলার ব্যাপারে কখনো তাঁর কোন আগ্রহও দেখা যায়নি।

1911 সালে আই এসসি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম স্থান লাভ করেন। মেঘনাদ সাহা ঢাকা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি হন তৃতীয়। মেঘনাদ সাহা এর পর কলকাতায় চলে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি· এসসি ক্লাসে ভর্তি হন।

বি· এসসি ক্লাসে মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নিখিলরঞ্জন নিলেন গণিত; জ্ঞান ঘোষ ও জ্ঞান মুখোপাধ্যায় নিলেন রসায়ন; শৈলেন ঘোষ, অমরেশ চক্রবর্তী এবং স্নেহময় দত্ত নিলেন পদার্থবিজ্ঞান।

1913 সালের বি এসসি অনার্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয় এবং নিখিলরঞ্জন তৃতীয়—বলাই বাহুল্য সকলেই প্রথম শ্রেণীতে। তার দু বছর পরে 1915 সালে এম· এসসি মিশ্র গণিতে একই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হল, কেবল নিখিল-রঞ্জন সেবছর পরীক্ষা দেননি। মাইনাস চোদ্দ পাওয়ারের চশমা-ধারী এই ছেলেটি ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল, যে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই কখনো দ্বিতীয় হয়নি। তবে পড়ুয়া ছেলেদের মত তিনি সর্বক্ষণ নিজের পড়াতেই ডুবে থাকতেন না, দিনের অনেকটা সময় সহপাঠী এবং বন্ধুদের পড়ানোতেও ব্যয় করতেন। হরিশ সিংহের বাড়িতে তাঁদের শিক্ষাদানের আসর বসত। তাঁর কাছে পড়ে উপকৃত হয়েছেন বিশেষভাবে নীরেন্দ্রনাথ রায়· ও দিলীপকুমার রায়। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ সবুজপত্র গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন এবং প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি তাঁর যাতায়াত সুরু হয়। আলাদা অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের কলেজ জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 1914 সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের ঠিক আগে একটি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হ্যারিসন, অপমান করেন। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই ছেলেরা দলে দলে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। মিটিং হল। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন। তিনি ছাত্রদের এই অপমান সহ্য না করার জন্য আহ্বান জানালেন। দিনের শেষে অধ্যাপক হ্যারিসন ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলেন। ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। তবে এর কয়েক বছর পরেই 1919 সালে সেই বিখ্যাত সুভাষচন্দ্র ও ওটেন সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ততদিনে কলেজ

থেকে বেরিয়ে গেছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 1964 সালে এক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন[9] "অধ্যাপক বসু আমার থেকে চার ক্লাস নিচে ছিলেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। 1913 সালে আমি তখন সদ্য এম· এ· পাশ করেছি। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ক্লাস করছি। যতদূর মনে পড়ে সেই ক্লাসে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। আমি জানতাম তাঁরা বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ছাত্র আমি—যে-সব ছাত্রেরা ভৌত বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয় নিয়ে চর্চা করছেন তাঁরা বয়সে ছোট হলেও তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।"

ভাষা শেখার সহজ ব্যুৎপত্তি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। 1908 সালেই তিনি এক ফরাসী ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ফরাসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। 1914 সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। পাত্রী ছিলেন শ্যামবাজারের কাছে কম্বুলিয়াটোলা নিবাসী ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান ঊষাবতী। তখনকার সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহের ব্যাপারে সত্যেন্দ্রনাথের কোন মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা ছিল না। তাঁর পিতা কাজ উপলক্ষে বাইরে বাইরে থাকতেন—কাজেই বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা করেন তাঁর মা। যদিও তরুণ সত্যেন তখন ইবসেন পাঠ করছেন কিন্তু তিনি এতই মাতৃ-পিতৃভক্ত ছিলেন যে এই বিয়েতে কোনই আপত্তি করেন নি। তাঁর মা যে মেয়েটিকে পছন্দ করলেন তিনি তাকেই বিবাহ করতে সম্মত হলেন অবশ্য তাঁর একটি সর্ত ছিল। তখনকার সামাজিক কুপ্রথা যৌতুক নেওয়া সম্বন্ধে সত্যেনের প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি বলেন পাত্রীর পিতার কাছ থেকে যদি কোন যৌতুক না নেওয়া হয় তবেই তিনি এই বিবাহে মত দেবেন। এই সর্ত পালন করা

হয়েছিল। অবশ্য আরেকটি সর্তও ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে দুশোজন বরযাত্রীকে যেন ভালভাবে আপ্যায়ন করা হয়। এতেই বোঝা যায় বন্ধুমহলে তিনি কতদূর জনপ্রিয় ছিলেন।

বিবাহের আগে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। তখনো বিবাহের প্রস্তাব আসেনি। ডক্টর যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বসু পরিবারে কোন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য তাঁদের বাড়িতে আসেন। জীবনী-কারকদের কাছে শ্রীমতী ঊষাবতী দেবী স্বয়ং এই ঘটনা বিবৃত করেছেন। সুদর্শন একটি তরুণ ডাক্তারবাবুকে আলো দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। ছেলেটিকে দেখেই তাঁর ভালো লাগে। অবশ্য তখনো তিনি জানতেন না পরবর্তী কালে এই ছেলেটিই তাঁর জামাতা হবেন।

ঊষাবতীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স এগারো। তিনি অবশ্য স্কুলে পড়েছিলেন—প্রথমে নিবেদিতা স্কুলে ও পরে মহাকালী পাঠশালায়। স্ত্রীকে উৎসাহী স্বামী ইংরেজী শেখাতে আরম্ভ করেন। পরে নিজেদের মেয়েদের বিবাহের সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাদের গ্র্যাজুয়েট হবার আগে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

3. কর্মজীবনঃ প্রথম পর্ব (1915—1920)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ অবশেষে কর্ম-জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। সামনে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের কি সম্ভাবনা তখন? তখনকার দিনে চাকরী পাওয়া ছিল দুষ্কর। সত্যেন্দ্রনাথ কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ছাত্র পড়িয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। গৌরীপুর রাজবাড়ীর কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, যিনি পরে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন, এই সময় সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন। দুটি জায়গায় তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হয় এই যুক্তিতে, যে তিনি চাকরীর তুলনায় অত্যধিক গুণসম্পন্ন।

অবশেষে সুযোগ এসে গেল। এই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষণ ও গবেষণা আরম্ভ করার চেষ্টা করছিলেন! ভারতে এই ধরনের প্রয়াস তিনিই সর্বপ্রথম করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের লোকের মনে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছে। এর জন্য যে ধরনের শিক্ষা ও প্রস্তুতি দরকার তখনকার স্কুল কলেজের শিক্ষায় তার একান্ত অভাব ছিল।

কিন্তু আশুতোষ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন। 1908 সালের আগে মাত্র কয়েকটি কলেজের পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আশুতোষ 1916 সালে এক পরিকল্পনা করেন যার ফলে বিশ্ব-

বিদ্যালয় কেবলমাত্র অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রকে স্বীকৃতি দান ছাড়াও শিক্ষাদান কেন্দ্রে পরিণত হবে। তিনি স্নাতকোত্তর ক্লাসও প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। নতুন ল্যাবরেটরী গড়ে তোলার ও ক্লাস নেবার জন্য লোক দরকার। স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানের ফলে 92 আপার সারকুলার রোডে (যার এখন নতুন নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হল। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্যার তারকনাথ পালিতের বাসভবনে খোলা হল জীববিজ্ঞান বিভাগগুলি।

1916 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ উভয়েই নবগঠিত ফলিত গণিত বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হলেন। কিন্তু ঐ বিভাগের ঘোষ অধ্যাপক ডঃ গণেশ প্রসাদের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর হওয়ায় দুজনেই আশুতোষের অনুমতিক্রমে চলে আসেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে, যদিও পদার্থবিজ্ঞান তাঁরা কলেজে পড়েছিলেন বি. এসসি. অবধি।

ইতিমধ্যেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে মহাসমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্যার পি. সি. রায় নিজের তত্ত্বাবধানে রসায়ন বিভাগটি ভালভাবে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে কোন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন না। দেবেন্দ্রমোহন বসু এই বিভাগে ঘোষ প্রফেসার নিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে জার্মানী পাঠান হয়। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। উনি সেখানে আটক রইলেন। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগটি গড়ে তোলার ভার পড়ল কয়েকজন তরুণের হাতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, শিশির মিত্র, শৈলেন ঘোষ (যিনি পরে উগ্র রাজনীতি করার জন্য দেশ ছাড়তে বাধ্য হন), ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। তাঁরা এত চমৎকারভাবে বিভাগটি গড়ে তোলেন যে যখন সি. ভি. রামন পালিত অধ্যাপক

হিসেবে যোগদান করেন তখন বিভাগের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দগতিতে চলছে।

নিজে থেকেই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে পাঠ নিতে আরম্ভ করেন সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁরা দুজনেই জার্মান ভাষা জানতেন। জার্মান ক্লাসে তাঁদের সহপাঠী ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তখন পদার্থবিজ্ঞানে এক যুগসন্ধিক্ষণের কাল। পুরণো চিন্তাধারা দ্রুত পালটে যাচ্ছে। কোয়ান্টামবাদ, আপেক্ষিকবাদ ও নীলস বোরের হাইড্রোজেন বর্ণালী তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসব নব-আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। কলকাতার অন্যান্য বয়স্ক শিক্ষকরা এইসব নতুন খবরের খোঁজ রাখতেন না। তাঁরা এম· এসসি· পাঠক্রমের সেই সনাতনী বিষয়বস্তুর বেশি জানতেন না—এইসব যুগান্তরকারী পরিবর্তনের খবর তাঁদের কাছে পৌঁছয়নি। আশুতোষ যে তরুণ গোষ্ঠীকে ভার দিয়েছিলেন তাঁরা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমটিকে একেবারে আধুনিকভাবে গড়ে তুললেন।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদান করার কেউ ছিল না। এই কাজে বাধাও ছিল পর্বত প্রমাণ। নতুন প্রকাশিত বইগুলি হাতে পাবার কোন উপায়ই ছিল না—সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সেটাই। সেই যুগে ভারতীয়দের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করা ছিল কল্পনা-তীত। কোথা থেকে বই পাওয়া যায় সেই চিন্তায় যখন তাঁরা উদভ্রান্ত এমন সময় তাঁদের সামনে এক অভাবনীয় সুযোগ এসে উপস্থিত হন।

হাওড়ায় শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তখন এক জার্মান

অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম পি· জে· ব্রুল। বিচিত্র কর্মজীবন ছিল এই অধ্যাপকের। যদিও তিনি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ডক্টরেট করেন, কিন্তু শারীরিক কারণে তাঁর খোলা জায়গায় থাকা বারণ হয়ে যায়। তখন তিনি বিষয় পরিবর্তন করে পদার্থবিজ্ঞান চর্চায় মন দেন। তাঁর ভারতে আসার কারণ এখানকার উষ্ণ জলবায়ু। তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে উষ্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ও সাহা ব্রুলের সাহচর্যে খুবই উপকৃত হন, কেননা ব্রুল তাঁদের বন্ধুর মত উৎসাহ দিতেন এবং এইসব বই-ই কিন্তু ছিল জার্মান ভাষায় লেখা। এর মধ্যে কিছু বই ছিল ম্যাক্স প্ল্যাংকের। সাহা আগে থেকেই জার্মান শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথও এই ভাষা চর্চা শুরু করলেন। সুবিধের জন্য দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে বিষয়গুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন। সাহার ভাগে পড়ল থার্মোডায়নামিক্স ও স্ট্যাটিস্টিকাল মেকানিক্‌স্। সত্যেন্দ্রনাথ পড়তে লাগলেন ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজ্‌ম্ এবং থিওরি অফ রিলেটিভিটি। দুই বন্ধুই উত্তর-কালে নিজেদের বেছে নেওয়া বিষয়গুলিতে গবেষণা করে বিশ্ব-বিখ্যাত হয়েছিলেন। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে যে দশটি মৌলিক আবিষ্কার হয়েছে, সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব তার মধ্যে একটি বলে স্বীকৃত। এই তত্ত্বের ফলে নক্ষত্রদেহের উপাদানগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের বোস-সংখ্যায়ন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ করে মৌলকণা ও অতি-পরিবাহিতার ক্ষেত্রে এখনো গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে মনে করা হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম গবেষণা পত্র—দি ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ফাইনাইট ভলিউম অফ মলিকিউলস অন দি ইকোয়েশান অফ স্টেট, অবস্থা সমীকরণের উপর অণুদের সীমিত আয়তনের প্রভাব, মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত। সাধারণত গাণিতিক প্রক্রিয়ার সুবিধের

জন্য গ্যাসে কতকগুলি প্রকল্পিত ধর্ম আরোপ করা হয় এবং তাকে আদর্শ গ্যাস বলা হয়। ভৌত পরিস্থিতিতে যে গ্যাস থাকে তার ধর্ম ঐ প্রকল্পিত ধর্ম থেকে ভিন্ন হয়। সেই বিষয়ে এই গবেষণা-পত্র। পত্রটি 1918 সালে লণ্ডনের ফিলসফিকাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

এর পরের দুটি গবেষণা-পত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে গাণিতিক বিষয়ে —দি স্ট্রেস ইকোয়েশান অফ ইকুইলিব্রিয়াম এবং অন দি হরপোল হোড। 1919 ও 1920 সালে এদুটি বুলেটিন অফ দি ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। 1920 সালে সত্যেন্দ্র-নাথের পরবর্তী প্রবন্ধ—অন দি ডিডাকশন অফ রিডবার্গস্ ল ফ্রম্ দি কোয়ান্টাম থিওরি অফ স্পেকট্রাল এমিশন প্রকাশিত হয় ফিল-সফিকাল ম্যাগাজিনে। এইসব প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা যায় সত্যেন্দ্রনাথের অঙ্কের উপর আশ্চর্যরকম দখল তো ছিলই, এবং সব সময়েই তাঁর প্রচেষ্টা ছিল সমস্যাটির একেবারে মূলে প্রবেশ করা।

এই সময়ে সাহার সহযোগিতায় সত্যেন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর মূল জার্মান প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। সঙ্কলনটি প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রসঙ্গত ঐ বিখ্যাত জার্মান প্রবন্ধগুলির এই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ।

মেঘনাদ সাহা দ্রুত সাফল্য অর্জন করতে থাকেন। তিনি 1919 সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য থিসিস দাখিল করেন। সেই বছরই তিনি ডি· এস-সি· দেন এবং ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন 1920 সালের মাঝামাঝি সময়ে।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যার আশুতোষের বনিবনা হচ্ছিল না। বেশ কয়েকবার তাঁদের মধ্যে মতান্তর হয়, একবার স্যার আশুতোষের

করা একটি অঙ্কের প্রশ্নপত্র নিয়ে। 1918 সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর দেবেন্দ্রমোহন বসু জার্মানী থেকে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে আশুতোষ ভারত সরকারের অর্থ-দফতর থেকে আর একটি গুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করেছেন—সি· ভি· রামন। তিনি তখন অবসর সময়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্সে গবেষণা করছেন। আশুতোষ 1917 সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপক মনোনীত করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ততদিনে অন্যত্র কাজের সন্ধান করছেন। ঢাকায় তখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে রীডার পদের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হল, আশুতোষ যখন একথা শুনতে পেলেন তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের বেতন বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে যাবেন বলে কথা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি সে কথা আর ফেরাতে সম্মত হলেন না।

দেবেন্দ্রমোহন বসু এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন,[10]

'1920 সালের পর থেকে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বড় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। অল্প জায়গার মধ্যে অনেকগুলি কৃতী বিজ্ঞানী, অথচ ল্যাবরেটরীতে তেমন সুযোগ নেই, যন্ত্রপাতিরও অভাব। কাজেই উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়া অনিবার্য ছিল। কয়েকজন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাওয়াতে অবস্থা একটু স্বাভাবিক হল। অবশ্য ক্রমে সুবিধাও বাড়ছিল এবং বিভাগ প্রসারিত হচ্ছিল। প্রথম যে বিজ্ঞানী দেশত্যাগী হলেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ।'

4. তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল

সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণত পড়াশোনা যা করার রাত্রেই করতেন, প্রদীপের আলোয়। দিনের বেলা কাটত বন্ধুদের সাহচর্যে, বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া একা তিনি বড় একটা কাটাতে ভালবাসতেন না। তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন বাছা-বাছা। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

1911 সাল নাগাদ পশুপতি ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের (দুই ভ্রাতা) বাড়িতে এত সময় কাটাতেন যে সেটা প্রায় তাঁর নিজের বাড়িতেই পরিণত হয়েছিল। হরলাল মিত্র স্ট্রীটে ছিল এই বাড়ি। ভট্টাচার্যরা ছিলেন শিক্ষিত, রুচিবান ও সঙ্গীতপ্রিয়। প্রচুর বই ছিল তাঁদের বাড়িতে। এই বাড়িতেই সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয় সত্যেন্দ্রনাথের এবং এখানেই তিনি একটি এসরাজ উপহার পান। পশুপতির গানের গলা ভাল ছিল। এসরাজে নানারকম পর্দার এদিক-ওদিক করে সত্যেন্দ্রনাথ নতুন নতুন রাগ ও সুর সৃষ্টি করতেন—পশুপতি তাতে কথা রচনা করতেন—এইভাবে কাব্য ও সঙ্গীত চর্চা করে বহু সময় অতিবাহিত হত। ছাদে বসে তাঁরা কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করতেন—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। নিচে থেকে পশুপতি ও গিরিজাপতি তাঁদের জন্য জলখাবার পাঠাতেন লুচি ও হালুয়া।

নিজের বাড়ির চেয়ে এখানেই বেশি সময় কাটাতেন সত্যেন্দ্রনাথ।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে হয় এই বাড়ির পরিশীলিত আবহাওয়া তাঁর মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করে। যোগ্য বন্ধু আকর্ষণ করার সহজাত প্রবণতা ছিল তাঁর। খুব শীঘ্রই তাঁর চারপাশে এসে জড় হলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, হরিশ সিংহ, হরিপদ মাইতি প্রভৃতি। যামিনী রায় কাছাকাছি বাগবাজারে থাকতেন। পশুপতির সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল এবং এই বাড়িতে যথেষ্ট যাতায়াত ছিল। এছাড়া আসতেন পূর্ণচন্দ্র সেন নামে সত্যেন্দ্রনাথের একজন সহপাঠী। ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁদেরই বয়সী আরেকটি তরুণ থাকতেন এই বাড়িতে। তার নাম ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য। যদিও তিনি এই পরিবারের আত্মীয় ছিলেন না তবু তিনি প্রায় তাদেরই একজন ছিলেন। ভূপালভূষণ কবিতা লিখতেন, ছন্দ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করা ছিল তাঁর খেয়াল। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ সবে বাংলা ছন্দকে সংস্কৃতের বন্ধন মুক্ত করে যুক্ত বর্ণকে এক মাত্রা ধরে কবিতা রচনা করছেন। সংস্কৃতে যুক্ত বর্ণকে দুই মাত্রা ধরা হয়। বাংলাতেও আগে এই রীতি অনুসৃত হত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম এই নিয়ম সাহস করে ভাঙলেন। তখনকার সাহিত্যপ্রেমিকরা তাঁর এই প্রয়াসকে সোল্লাসে সমর্থন জানালেন।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে —

এইসব পংক্তিগুলি তখন লোকেদের মুখে মুখে ফিরত। পশুপতি, পরে যিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন—লেখার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির একটি সমালোচনা লিখে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। সেই লেখাটি নিশ্চয়ই তরুণ সত্যেনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, কারণ ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি প্রস্তাব করেন একটি হাতে-

লেখা পত্রিকা বার করার। সত্যেনই হবেন তার সম্পাদক। পত্রিকাটির নাম ঠিক হল মনীষা। সত্যেন্দ্রনাথ যখন থার্ড ইয়ারে পড়েন তখন এর প্রথম সংখ্যা বার হয়। তাতে সম্পাদক নিজে একটি ধারাবাহিক কাহিনী লিখেছিলেন। আসামের জঙ্গলে যেখানে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেখানে ছুটিছাটায় তিনি যেতেন। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী। লেখায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকাটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাহিনীটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আরো পরিতাপের বিষয়, পত্রিকাটির সব কটি সংখ্যাই হারিয়ে গেছে। তবে পত্রিকাটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে মনে হয় এটি ছিল সাহিত্য হিসেবে বেশ উঁচুদরের।

কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার, যা সাধারণভাবে হেদুয়া নামে পরিচিত, ছিল তাঁদের আর একটি প্রিয় আড্ডার স্থল। এখন অবশ্য এর নতুন নামকরণ হয়েছে আজাদ হিন্দ বাগ। ক্লাসের পরে বন্ধুরা এখানে মিলিত হতেন। তখন ওখানে সাঁতার কাটার ক্লাব ছিল না। জায়গাটিতে এখনকার মত অত ভিড়ও ছিল না। হারীত-কৃষ্ণ একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যেতেন। প্রায় ষাট বছর পরে, সত্যেন্দ্রনাথের আশী বছরের জন্মদিনে আকাশবাণী কলকাতা থেকে তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য একটি অনুষ্ঠান হয়। তাতে ছাত্র বয়সে যেসব গান সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল, সেইসব গান বাজিয়ে শোনানো হয়—উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথকে চমক দেওয়া।

বাঙালীদের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস সুবিদিত। সত্যেন্দ্রনাথ এই অভ্যাসটি চর্চার দ্বারা আরো বাড়িয়েছিলেন। অনেকের কাছে হয়ত মনে হতে পারে এটা বৃথা সময়ক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু

তেমন লোকের কাছে আড্ডা যথেষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধির খোরাক জোগাতে পারে। কলেজের পরে এই খোলা হাওয়ার আড্ডাতেও তাঁদের মন ভরত না, তাঁরা যেতেন হারীতকৃষ্ণের বাড়িতে। হারীতকৃষ্ণের পিতা অসীমকৃষ্ণ ছিলেন স্নেহশীল ও সহৃদয়। পুত্রের বন্ধুরা গান শুনতে ভালবাসে বলে তিনি একটি অর্গ্যান কিনে দেন। এই বাড়িতে প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি গুণিজনেরও সমাগম হত।

প্রমথ চৌধুরী পেশাগতভাবে ব্যারিস্টর হলেও ছিলেন সাহিত্য-প্রেমী ও সুপণ্ডিত। বিশেষ করে সঙ্গীত ও ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তিনি। তিনি সবুজপত্র নামে যে পত্রিকা বার করেন তাকে ঘিরে এক বুদ্ধিদীপ্ত লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তখন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষার কাল। প্রমথ চৌধুরী প্রথম চলিত ভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত করলেন। তাঁর রচনা-ভঙ্গী ছিল সরস, পরিমার্জিত ও রুচিসম্পন্ন—তিনি বাংলায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও এই সবুজপত্রগোষ্ঠী কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

এতদিন যেসব উদ্দেশ্যহীন আড্ডায় সময় কাটত তার থেকে ক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ এই রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আলোচনাচক্রে আসতে আরম্ভ করলেন। সবুজপত্র গোষ্ঠীর পক্ষে তাঁকে দলে পাওয়া ছিল পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ এদের সব আলোচনায় স্বচ্ছন্দভাবে যোগ দিতেন তিনি কিন্তু কখনো সবুজপত্রে এক লাইনও লেখেন নি। তাঁর চরিত্রে কিছু আপাত বৈপরীত্য ছিল—যা পরে তাঁর বহু অনুরাগীকে বিভ্রান্ত করেছে। প্রমথ চৌধুরী এই সম্পর্কে গূঢ় একটি মন্তব্য করেনঃ 'সম্ভবত উনি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন।'

ব্রাইট স্ট্রীটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে সবুজপত্র গোষ্ঠী মিলিত হত। এই দলে ছিলেন সুধীরচরণ সিংহ, সোমনাথ মৈত্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, মাণিকলাল দে, বরদাচরণ গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

শুধু সাহিত্য নয়—দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিয়ে এখানে তর্ক-বিতর্ক হত। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সুধীরা যোগ দিতেন এইসব আলোচনায়। নতুন কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন তাঁরা—নতুন প্রকাশনগুলি সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করতেন। বই অবশ্য সবচেয়ে বেশি কিনতেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর কাছ থেকে নিয়ে অন্যেরা পড়তেন। সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন:[11]

"পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্প বিস্তর নতুন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তাছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটা আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতদিন বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যেও

আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকেদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি—তার ভাগটা দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণে আমি আপনাকে সবুজপত্রের আসরে নামাতে চাই।"

ঢাকা চলে যাবার আগে পর্যন্ত এঁদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগা-যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। তবে ঢাকা চলে যাবার পরেও যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরিচালিত 'বিচিত্রা'র আসরেও সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই উপস্থিত হতেন। তবে সেখানে তিনি বড় একটা মুখ খুলতেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল নীরব শ্রোতার।

অনেক পরে 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করে। সবুজপত্রের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকা আধুনিক ও উদারপন্থী। তবে সবুজপত্র অনেকটা সনাতনপন্থী ছিল, পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে ইউরোপীয়। এর প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন 'বিজ্ঞানের সংকট' নামে প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ ছিল আইনস্টাইনের উপর। পরিচয় প্রথম পাঁচ বছর ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়, পরে এটি মাসিকপত্র হয়ে যায়। সবুজপত্রের মত পরিচয় গোষ্ঠীও সম্পাদকের গৃহে মিলিত হতেন। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তও ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু। ছুটিতে কলকাতা এলেই তিনি

যেখানেই থাকুন পরিচয়ের আড্ডায় যোগ দিতে যেতেন। সেজন্য দরকার হলে শহরের অন্য প্রান্ত থেকে হেঁটে আসতেও দ্বিধা করতেন না।

যেখানেই যান সত্যেন্দ্রনাথ অতি সহজেই তাঁর চারপাশে গুণি-জ্ঞানীদের একটা আড্ডা গড়ে তুলতে পারতেন। ঢাকায় তাঁরা 'বারোজনা' নামে একটি ক্লাব সুরু করেন। এর সদস্য ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহমুদ হোসেন, আর্থার হিউজেস, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, বীরেন্দ্রলাল দে। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার ছিলেন ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী। কিন্তু বারোজনা গঠিত হবার আগেই তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন।

5. ঢাকা ও ইউরোপ (1921—1926)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় 1921 সালে। উপাচার্য ছিলেন স্যার ফিলিপ হারটগ। হারটগ যেসব মেধাবী শিক্ষকদের ঢাকায় আনেন সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের অন্যতম। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যিনি অধ্যাপক ছিলেন তাঁর নাম ডক্টর ডব্লু. এ. জেংকিনস, 'ততটা বুদ্ধিমান না হলেও ভালোই'[12] ছিলেন লোকটি। তিনি অন্তত প্রতিভাবান লোকের খোঁজ পেলে তাঁদের যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন —এই গুণ তাঁর ছিল। হারটগের সঙ্গে লণ্ডনে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেরও দেখা হয়েছিল। তাঁর কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে হারটগ তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে অধ্যাপক হয়ে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান।

ঢাকায় আসার একমাস পরে বন্ধু ও সহপাঠী মেঘনাদ সাহাকে সত্যেন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার খানিকটা চিত্র পাওয়া যায়ঃ[13]

'মাসখানেকের উপর তোমাদের দেশে এসেছি। এখানকার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি। তোমাদের ঢাকা কলেজে জিনিস অনেক ছিল, কিন্তু অযত্নে তাদের যে দুর্দশা হয়েছে তা বোধ হয় নিজেই কতক জান। সাহেবদের Table-এর উপর অনেক Nicol lens, eye piece ছড়ান আছে, কোন apparatus-এর part তা ঠিক করতে হলে research করতে হবে।

এখানে Journal-এর অভাব, তবে নতুন university-র কর্তারা Back number সমেত অনেক Journal order দেবেন, এই ভরসা দিয়েছেন। Science Library আলাদা হবার কথা হচ্ছে।'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সদ্য গঠিত কেন্দ্র, যেখানে লাইব্রেরীতে তখনো আধুনিক পত্রিকাদি এসে পেঁছয় না—এখানে অবতীর্ণ হলেন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন ও ক্ষুরধার মনীষা নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার, নবতম ধ্যান-ধারণায় তাঁর মন তখন আন্দোলিত। কলকাতায় এইসব নতুন ধারণার ঢেউ ইতি-মধ্যেই পেঁাছে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দীর্ঘকাল অন্তরীণ থাকার পর 1919 সালে দেবেন্দ্রমোহন বসু দেশে ফিরেছেন। তিনিই প্রথম সত্যেন্দ্রনাথকে ম্যাক্স প্ল্যাংক-এর Thermodynamik und Warmestrahlung বইটির একটি কপি উপহার দেন। জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংক আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান স্থপতি। 1900 সালে তিনিই কোয়ান্টামবাদের সূচনা করেন। এই মতবাদ অনুসারে শক্তি ক্রমাগত প্রবাহের মত নির্গত হয় না। মাঝে মাঝে এক ঝাঁকের মত বার হয়ে থাকে। বিখ্যাত সমীকরণ $E=hv$ তাঁরই প্রবর্তিত। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্ল্যাংক তাঁর distribution of energy from a black body সম্বন্ধে যা লেখেন সত্যেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। প্ল্যাংক তাঁর মতবাদটি যে ভাবে উপস্থিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছিলেন না কারণ তিনি কোনরকম জোড়াতালি দেওয়া পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মত খুঁতখুঁতে লোকের পক্ষে প্ল্যাংকের প্রমাণটি মেনে নেওয়া ব্যাপারটিতে সায় দেওয়া কঠিন ছিল।

তিন বছর পরে 1924 সালে জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকা Zeitschrift fuer Physik-এ সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ Plank's Law and Light

Quantum Hypothesis প্রকাশিত হয়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন সত্যেন্দ্রনাথ। আসলে প্রবন্ধটি এর আগেই তিনি Philosophical Magazine-এ প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং এর একটি কপি আইনস্টাইনের কাছেও পাঠান মতামতের জন্য। আইনস্টাইনকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি ছিল এইঃ

ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
4 জুন, 1924

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার মতামতের জন্য আমি সাহস করে এই প্রবন্ধটি পাঠালাম। আপনি এটা পড়ে কি মনে করেন জানতে আমি খুবই উৎসুক। আপনি দেখবেন এতে আমি সনাতনী তড়িৎবলবিদ্যার সাহায্য না নিয়েই $\frac{\pi v^2}{c^3}$ ধ্রুবকটিতে পৌঁছতে পেরেছি। অবশ্য এতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রাথমিক দশাদেশে h^3 উপাদানটি আছে। এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করার মত যথেষ্ট জার্মান আমি জানি না। আপনি যদি মনে করেন এটি ছাপার যোগ্য তা হলে Zeitschrift fuer Physik পত্রিকায় এটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলে কৃতজ্ঞ হব। যদিও আপনি আমাকে চেনেন না তবু অসঙ্কোচে আপনার কাছে এই অনুরোধ জানালাম কারণ লেখার মাধ্যমে আপনি আমাদের সকলেরই গুরুস্থানীয়। কলকাতা থেকে একজন আপনার আপেক্ষিকবাদের প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদের অনুমতি প্রার্থনা করে চিঠি দেয়, আপনার স্মরণ আছে কিনা জানি না।

আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন। বইটি পরে প্রকাশিতও হয়েছিল। আমিই আপনার সাধারণ আপেক্ষিকবাদ প্রবন্ধটি অনুবাদ করি।

আপনার বিশ্বস্ত
এস· এন· বোস

অল্পদিনের মধ্যেই আইনস্টাইনের অনূদিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। তার সঙ্গে অনুবাদক নিম্নোক্ত টীকা যোগ করেন।

'আমার মতে প্ল্যাংকের সূত্র থেকে বোস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সূচনা করছে। আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্বন্ধেও এই মতবাদ প্রযোজ্য। এই বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করব।'

এই সবই এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। এর পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজটির সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আইনস্টাইনের ভূমিকা এক্ষেত্রে বাড়িয়ে এত দেখান হয়েছে যে এই নবীন এবং অপরিচিত বিজ্ঞানীর কাজটি, যে কাজ নিয়ে তিনি বিশ্বের বিজ্ঞান সভায় প্রবেশ করলেন—অনেকটাই আড়ালে পড়ে গেছে। কি কারণে বোসের এই প্রবন্ধটিকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা বুঝতে গেলে তাঁর বক্তব্যটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তাঁর প্রবন্ধটির সারমর্ম সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল, তবে অবশ্যই একে সুবিধার জন্য অনেকটা সরলীকৃত করতে হয়েছে। কোন বন্ধ জায়গায় দেওয়ালের ছোট-ছোট ছিদ্র দিয়ে বিকিরণের বর্ণালী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই মাপা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রচলিত মতবাদ দিয়েই এই বিকিরণের ধর্ম ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। অবশেষে প্ল্যাংক একটি মতবাদ খাড়া করলেন। প্ল্যাংকের অনুমানকে

আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন সম্ভবত এই বিকিরণজাত শক্তি ঝাঁক বেঁধে অর্থাৎ কোয়ান্টা রূপে বার হয়ে থাকে। তবুও প্ল্যাংকের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হল না কারণ তিনি সনাতনী বিদ্যুৎ-বলবিদ্যার সঙ্গে একটা ইচ্ছামত অনুমানের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন। এর উপর সংশোধন করার অনেক চেষ্টা হয়। প্ল্যাংকের যুক্তি ঠিক মনোমত না হওয়াতে সত্যেন্দ্রনাথ এই নিয়ে চিন্তা করতে সুরু করেন। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন যার মধ্যে কোন পর্যায়েই ইচ্ছামত অনুমানের কোন স্থান ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে কেবলমাত্র একটি নতুন সূত্র বললে সব কিছু বলা হল না। তিনি পদার্থবিজ্ঞানে একটা নতুন ধারণার সূত্রপাত করলেন, পুরবর্তী কালে যা বোস সংখ্যায়ন নামে পরিচিত হয়। এর কার্যকারিতা বুঝতে পেরে আইনস্টাইন অবিলম্বে একে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এক নতুন সম্পর্কের অবতারণা করলেন। এই সম্পর্ক বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত।

সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ লেখার ইতিহাস পাওয়া যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র পি· কে· রায়ের লেখায়ঃ[14]

"বোস যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁর স্ট্যাটিসটিকাল মেকানিকস ও গ্যাস থিওরী সম্বন্ধে জ্ঞান খুব সম্পূর্ণ নয়—বরং ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম ও আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কেই তাঁর জ্ঞান ছিল বেশি। 1924 সালের মার্চ মাসের কিছু পরে তাঁর সঙ্গে সাহার দেখা হয়। আলোচনা কালে সাহা Zeitschrift fuer Physik পত্রিকার সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের দিকে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবন্ধ দুটি ছিল পাউলি ও আইনস্টাইন এবং আর্নফেস্টের,

দুটিরই প্রকাশকাল 1923। সাহা পত্রিকা দুটি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে রেখেও গিয়েছিলেন। পাউলির প্রবন্ধে একটি অদ্ভুত সম্পর্কের কথা নিয়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। কি সেই অদ্ভুত সম্পর্ক?

1923 সালের গোড়ার দিকে কম্পটন ও ডিবাই ইলেকট্রনের এক্স-রে বিক্ষেপণ নিয়ে যে কাজ করেন তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পাউলি তখন বয়সে তরুণ। তিনিই কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে অনেক চিন্তা করে অবশেষে মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া বিষয়ে কোয়ান্টাম সম্পর্ক বার করেন। তিনি পারস্পরিক ক্রিয়াটি এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যাতে ম্যাক্সওয়েল বণ্টনসম্পন্ন গতিবেগওয়ালা ইলেকট্রনগুলি বিকিরণের সঙ্গে সুস্থিত অবস্থায় থাকতে পারে। অবশ্য ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বিকিরণের বর্ণালী বণ্টন প্ল্যাংকের সূত্র অনুযায়ী হবে। এইভাবে ফোটন ও ইলেকট্রনদের মধ্যে কম্পটন বর্ণিত পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা কত হতে পারে পাউলি তার একটি গাণিতিক সূত্র দেন। এই সূত্রে অবশ্য দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশ বিকিরণের প্রাথমিক কম্পাংকের ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। অন্য অংশটি নির্ভর করে কম্পটন-প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিকিরণের কম্পাংকের ঘনত্বের উপর। এই দ্বিতীয় অংশটিই বিভ্রান্তিকর। দার্শনিক চিন্তার দিক দিয়ে এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ কৌতূহলের উদ্রেক করে কেননা যা ঘটছে তার অস্তিত্বের জন্য এমন একটি ঘটনা অনুমান করা হয়েছে যা এখনো ঘটেনি। আইনস্টাইন ও আর্নফেস্টের প্রবন্ধটি পাউলির কাজের উপরই ভিত্তি করে একটা সাধারণ রূপ দেওয়া।

পাউলির এই কাজটিকে সত্যেন্দ্রনাথ পাগলামি বলে অভিহিত

করতেন। এই পাগলামির দিকে কিন্তু প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাহা। এইভাবেই তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বিকিরণ ও পরি-সংখ্যান পদার্থবিদ্যার রহস্যময় জগতে প্রবেশ করলেন। ডিবাই-এর 1916 সালের এবং আইনস্টাইনের 1917 সালের অসাধারণ প্রবন্ধ দুটির সঙ্গেও পরিচিত হলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বোসের দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও প্রস্তুত হল— Thermal Equilibrium in Radiation Field in the Presence of Matter. আগেরটির মত এই প্রবন্ধটিও তিনি আইনস্টাইনকে পাঠালেন। আইনস্টাইন কৃত জার্মান অনুবাদটি 1924 সালে Zeitschrift fuer Physik পত্রিকায় প্রকাশিত হল। তবে প্রবন্ধের শেষে আইনস্টাইন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য যোগ করেন যে সত্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন। কেন নন তার কারণও তিনি দেখান।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে সত্যেন্দ্রনাথের এই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দুটির কোনটিই এর মধ্যে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়নি। 1974 সালে একই সঙ্গে এই দুটি প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান ফিজিক্স অ্যাসোসিয়েশন যথাক্রমে Physics Teacher ও Physics News পত্রিকা দুটির এপ্রিল ও জুন সংখ্যায়।

ইতিমধ্যে বিদেশ যাবার জন্য ছুটির দরখাস্ত করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন বড়ই আর্থিক দুরবস্থা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অধ্যাপকদের মাইনে বেশি ছিল। কিন্তু প্রথম কয়েক বছরে বাড়ি তৈরির কাজেই সব টাকা নিঃশেষিত হয়। তখন গভর্নিং বডি বেতন কমাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সকলে এতে সম্মত হলেন না। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল। সত্যেন্দ্রনাথ নতুন বেতন হার নিতে এই সর্তে রাজি হলেন যে ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর সমস্ত খরচ এবং যাতায়াতের ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবেন।

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ পড়ে আইনস্টাইন যে মন্তব্য করেন তাতে তাঁর ইউরোপ যাত্রার পথ সুগম হয়। হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ডে আইনস্টাইন তাঁকে প্রশংসা করেন, লেখেন যে এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে ছুটি দিতে প্রথমটা ইতস্তত করলেও এই চিঠি দেখে আর অমত করতে পারলেন না। কলকাতায় জার্মান কনস্যুলেট থেকে তাড়াতাড়ি ভিসা পেতেও এই পোস্টকার্ড সাহায্য করেছিল।

বোম্বাই থেকে যাত্রা করে 1924 সালের অক্টোবরে প্যারিস পেঁাছলেন সত্যেন্দ্রনাথ। নতুন জায়গায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন কিনা এই নিয়ে মনে যে আশংকা ছিল না তা নয়। কিন্তু প্যারিসে পেঁাছেই তাঁর সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর আলাপ হওয়ায় সে ভয় তিরোহিত হল। বাগচী বিখ্যাত ফরাসী ভারততত্ত্ববিদ সিলভা লেভির কাছে গবেষণা করছিলেন। বাগচীর বয়স তখন চব্বিশ পঁচিশ হবে, সত্যেন্দ্রনাথের ঊনত্রিশ। নিজের দেশ থেকে সমবয়সী একজনকে পেয়ে তিনি পরম আশ্বস্ত হলেন। বাগচী তাঁর অনেক সুবিধা করে দেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে লেভির কাছে নিয়ে যান, ফরাসী বিজ্ঞানী পল লাজভাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন। লাজভাঁ ছিলেন পিয়ের কুরীর ছাত্র। যে মিউনিসিপাল স্কুলে রেডিয়ম আবিষ্কার হয় তার প্রধান ছিলেন তিনি।

প্যারিসে সত্যেন্দ্রনাথের বাসস্থান ছিল 17 নং রু দ্যু সোমারাঁ। এই বাড়িতেই ছিল ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠন—ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস

অ্যাসোসিয়েশন। বাগচী ছিলেন এই সংগঠনের সম্পাদক। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছাত্ররা এখানে আশ্রয় লাভ করত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এদের শাখা ছিল, তবে কেন্দ্র ছিল প্যারিস।

ভারততত্ত্ব যদিও সত্যেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল না তবু তিনি বাগচীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এইভাবে দুজনের মধ্যে যে সখ্য গড়ে ওঠে তা সারাজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল, প্রসঙ্গত, বাগচী বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসেবে কর্মরত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঐ পদে মনোনীত হন।

সত্যেন্দ্রনাথের আসার কয়েক সপ্তাহ আগেই তাঁর বাল্যবন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য প্যারিসে এসে পোঁছন। তিনি আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একই জাহাজে। বলাই বাহুল্য, দুই বন্ধুর পুনর্মিলনে দুজনেরই আনন্দের অবধি ছিল না।

আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ অধীর হয়ে উঠেছিলেন। প্যারিস থেকে তিনি তাঁকে এক চিঠি লেখেন। চিঠির অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হলঃ

"প্রিয় গুরুদেব,

আমার প্রবন্ধটি আপনি যে কষ্ট করে অনুবাদ করেছেন এবং ছাপার ব্যবস্থা করেছেন সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। দেশ ছাড়ার ঠিক আগেই আমি প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখে এসেছি। জুনের মাঝামাঝি আমি আপনাকে আর একটি প্রবন্ধ পাঠাই—নাম Thermal Equilibrium in Radiation Field in Presence of Matter.

এটি সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানতে আমি উৎসুক কারণ আমার মনে হয় এটিরও গুরুত্ব আছে। Zeitschrift fuer Physik

পত্রিকায় এটি ছাপানো সম্ভব হবে কিনা জানি না।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আমি দুই বছরের জন্য পড়া-শোনা করার ছুটি পেয়েছি। এক সপ্তাহ হল প্যারিসে এসেছি। জার্মানীতে আপনার অধীনে কাজ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না, তবে আপনি যদি সে অনুমতি দেন তবে আমি আনন্দিত হব। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তাহলে পূর্ণ হয়।........"

সেই বছরই শেষের দিকে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে আইনষ্টাইনের মন্তব্য যে তিনি লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

প্যারিসে থাকার সময় সত্যেন্দ্রনাথ মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরীতে কাজ করার বিষয়ে খোঁজ করেন। লাজভাঁ তাঁকে এই প্রস্তাব দেন। লাজভাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি যেখানে যান সর্বত্রই তাঁর কাছে বন্ধ দরজা খুলে যায়—তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান। সত্যেন্দ্রনাথের কাজের সুনাম মাদাম কুরীও শুনেছিলেন, তাছাড়া লাজভাঁর পরিচয়পত্রও ছিল, কাজেই তিনি সানন্দে তাঁকে কাজ করতে দিতে সম্মত হলেন। তবে বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আগে তিনি ভাষা নিয়ে অসুবিধে ভোগ করেছিলেন তাই তিনি ফরাসী ভাষা শেখা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন। তিনি বলেন, বোস যেন মাস চারেক ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে তার পরে তাঁর কাছে কাজ করতে আসেন। তিনি অবশ্য ধরেই নিয়েছিলেন যে এই তরুণ ভারতীয়টি মোটেই ফরাসী জানে না। তিনি বোসকে মোটেই এ-কথা বলার সুযোগ দিলেন না যে তিনি ফরাসী বেশ ভালভাবেই জানেন। বহু বছর ধরে সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা শিখেছেন, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। মাস পাঁচেক পরে তিনি আবার প্যারিসে

এসে রেডিয়ম ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবজাত কৌতূহল ছিল নানা বিষয়ে। প্যারিসে থাকা অবস্থায় তিনি এক্স-রের সাহায্যে কেলাসের গঠন বিশ্লেষণ সম্পর্কে উৎসাহী হন। সেই সময় বিখ্যাত ডি ব্রগলী ভ্রাতৃদ্বয় এক্স-রে কেলাসতত্ত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ডি ব্রগলীদের গ্রামের বাড়িতেও তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে বন্ধুত্ব করা সহজ হত। ইউরোপে প্রথমবার গিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ অনেক বন্ধুলাভ করেন—এইসব ইউরোপীয় বিজ্ঞানী-দের অনেকের সঙ্গেই তাঁর সারাজীবন যোগাযোগ ছিল।

1926 সালে ঢাকা ফিরে যাবার পর সত্যেন্দ্রনাথ এক্স-রে কেলাসতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান খুব কাজে এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই বিষয়ে একটি ভাল গবেষণাগার গড়ে তুলেছিলেন।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী পুরুষদের সাহচর্যে এক বছর ফ্রান্সে কাটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বার্লিনে এলেন। 1925 সালের 8 অক্টোবর তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি পাঠান। তাঁদের তখনই দেখা হয়নি কারণ আইনষ্টাইন তখন বার্লিনে ছিলেন না। তিনি ফিরে আসার পর সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এর পর এক বছর কাটে সেমিনার, আলোচনাচক্র প্রভৃতিতে যোগ দিয়ে, পড়াশোনা করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপে।

বার্লিনে থাকতে থাকতে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু দিকপাল বিজ্ঞানীর পরিচয় হয়। এ'দের মধ্যে ছিলেন ফ্রিটজ্ হেবার, অটো হান, লিজে মাইটনার, ওয়ালটার বোথে, হানস গাইগার, পিটার ডিবাই, ভন লাউএ, উলফগ্যাং পাউলি, ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ প্রভৃতি। এ'দের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পান। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি

জার্মানীতে বরাবরই ছিল, তবে এ'রা এই সুনামকে এক আধুনিক ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। জার্মানী, কিংবা আরো ভাল করে বলতে গেলে বার্লিন ছিল সেই সময় বিজ্ঞানের নবতম ধ্যান-ধারণার কেন্দ্র—সারা পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে আসতেন। 1921 সালে সাহা ও জ্ঞান ঘোষকে লিখিত এক চিঠিতে[15] আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের যতটা সম্ভব বেশি সময় জার্মানীতে কাটাতে উপদেশ দেন।

"এ প্রকার মনীষীদের সংস্পর্শে আর জীবনে কখনো আসিতে পারিবেন না। বাস্তবিক দু-একজন বাদ দিলে ইংলণ্ডে সকলেই mediocre আমরা subject race এই মনে করিয়া বোধ করি তাহারা আমাদের কাজ মন খুলিয়া appreciate করিতে পারে না।"

1926 সালের গ্রীষ্মকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা ফিরলেন। ইউরোপ থেকে প্রতি সপ্তাহেই তিনি বাড়িতে চিঠি দিতেন, বিশেষ করে মাকে। মার খুবই অনুগত ছিলেন তিনি।

1921 সালে ঢাকা চলে আসার সময় তাঁর মা বাবা কলকাতায় থেকে যান। তখন গোয়াবাগানের বাড়িতে সত্যেন্দ্রনাথের কাকা, কাকিমা, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, পিসিমা ইত্যাদিরা থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথের মা অবশ্য মাঝে মাঝে ঢাকায় যেতেন, তবে বেশি দিন থাকতে পারতেন না। বাবা যেতেন কম কারণ তাঁর ব্যবসা দেখতে হত। মা ও বাবা একসঙ্গে কখনো যান নি, কারণ কলকাতার সংসার দেখাশোনার জন্য একজনকে থাকতেই হত।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান নীলিমার জন্ম হয় 1916 সালে, কম্বুলিয়াটোলায়, ঊষাবতীর পিতৃগৃহে। ছোট ছেলে রাম ছাড়া তাঁর নয়টি সন্তানের সকলেরই জন্ম সেখানে। দুঃখের বিষয়, তাঁর দুটি সন্তান অল্প বয়সেই মারা যায়। তার দ্বিতীয় সন্তান,

শিশুপুত্র বেনারসে এক বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় মারা যায়। তৃতীয় সন্তান, একটি কন্যাও এক বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যায়, ঢাকায়। চতুর্থ সন্তানের জন্ম 1922 সালে নাম পূর্ণিমা, বাড়ির নাম পচা। তারপরে জয়ার জন্ম হয় 1925 সালে।

6. ঢাকা (1927—1945)

1926 সালে সত্যেন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদটি শূন্য। নির্বাচকমণ্ডলী এই পদের জন্য দেবেন্দ্রমোহন বসুর নাম প্রস্তাব করেন। দ্বিতীয় নামটি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের, দেবেন্দ্রমোহন তখন কলকাতায় পদার্থবিজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক। তিনি গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। পাশেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তাঁর মাতুল জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাগার। তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত পদটি নিতে তিনি সম্মত হলেন না। সত্যেন্দ্রনাথ এই পদটির মনোনয়ন পেলেন এবং 1945 সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ফ্রান্স ও জার্মানীর আধুনিক যন্ত্রসম্বলিত ল্যাবরেটরীগুলিতে কাজ করে আসার পর ঢাকায় নিজের ল্যাবরেটরী তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খুব অন্যরকম বোধ হয়েছিল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ একেবারে গোড়া থেকে সুরু করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণাগার দেখার সময় তাঁর মনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল—কি করে দেশে ফিরে অনুরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সম্পূর্ণ একটি গবেষণাগার, একটি ওয়ার্কশপ ও প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী—এই তিনটি জিনিস গড়ে তোলার দিকে তিনি মনোযোগী হলেন। কারণ গবেষণা ও শিক্ষণের কাজে এই কয়টি জিনিস

অপরিহার্য। যদিও তাঁর নিজস্ব বিষয় ছিল গাণিতিক পদার্থ-বিজ্ঞান, তবু তিনি কেবল এইটুকুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে ছাত্র ও সহকর্মীদের পরীক্ষামূলক গবেষণায় উৎসাহিত ও প্ররোচিত করতে লাগলেন। পরীক্ষা-ঘটিত ও তাত্ত্বিক ব্যাপারে নতুন নতুন চিন্তার খোরাক তিনি তাদের সব সময়েই জোগাতেন। তাঁর ঢাকায় থাকাকালীন অবস্থায় সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে X-ray spectroscopy, X-ray diffraction, magnetic properties of matter, optical sptctroscopy, Raman spectra, wireless ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার বিশেষ সুযোগ সুবিধা গড়ে ওঠে। ঢাকাতে এই সময়ে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই পরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কে· এস· কৃষ্ণনের।

ডঃ কৃষ্ণন প্রথমে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে সি· ভি· রামনের কাছে গবেষণা সুরু করেন। রামন বিক্ষেপণ বা Raman Scattering নামক ঐতিহাসিক কাজটিতে তিনি রামনের সহকর্মী ছিলেন। এর পরে কৃষ্ণন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার হিসেবে যোগদান করেন। 1929 থেকে 1933 পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ছিলেন। কলকাতায় রামনের সঙ্গে কাজ করার সময় magnetic anisotropy সম্বন্ধে কৃষ্ণনের আগ্রহ জন্মায়। ঢাকায় এসে সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে এবং গবেষণার অনুকূল পরিবেশে তিনি এ জাতীয় কাজে অনেক দূর অগ্রসর হন। সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত, তাঁর সহকর্মীরা প্রয়োজন হলেই তাঁর দ্বারস্থ হতেন। কৃষ্ণন crystal-এর magnetic anisotropy মাপার নিখুঁত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই বিষয়ে তাঁর এবং তাঁর ছাত্রদের—বি· সি· গুহ; এস· ব্যানার্জী; এন· সি· চক্রবর্তী; এ· মুখার্জী; এ· বোস ইত্যাদিদের

কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। 1933 সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক পদ পেয়ে কৃষ্ণন চলে যান। 1942 সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। স্বাধীনতার পর যখন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণন হন তার প্রথম ডিরেক্টর। 1940 সালে তিনি ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। 1961 সালে 63 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য কৃতী পদার্থবিদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ডঃ কেদারেশ্বর ব্যানার্জী। তিনি ঢাকায় রীডার হিসেবে যোগদান করেন 1933 সালে এবং 1943 পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। কেদারেশ্বর ব্যানার্জীর পড়াশোনা কলকাতায়, গবেষণা সুরু হয় সি· ভি· রামনের কাছে। Diffraction of X-rays by liquids নিয়ে তাঁর মৌলিক কাজ কেলাসের গঠন বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। 1931 সালে তিনি ইউরোপ গিয়ে বিভিন্ন ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করেন। ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি যেমন লাভবান হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর সাহচর্যে উপকৃত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের X-ray ল্যাবরে-টরীর সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই গবেষণাগারে কাজ করে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আর· কে· সেন; আবদুল মতিন চৌধুরী (যিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য); এস· সেন; এস· বি· ভট্টাচার্য; সি· আর· বাসু ইত্যাদি। কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 1943 সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক, 1948 সালে এলাহাবাদে অধ্যাপক ও 1959 সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টর হন। 1965 সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর দশ বছর পরে 74 বছর

বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানেই গেছেন সেখানেই তাঁকে ঘিরে সুযোগ্য ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

ঢাকায় সত্যেন্দ্রনাথের সহকর্মী ছিলেন ডঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। তিনি সেখানে 1931 থেকে 1945 পর্যন্ত পদার্থবিদ্যায় রীডার ছিলেন। প্রথম দিকে খাস্তগীরের আগ্রহ ছিল X-ray সংক্রান্ত গবেষণায়। ঢাকায় আসার পর তিনি বিষয় পরিবর্তন করেন। বিদ্যুৎ, চুম্বক ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে আবহমণ্ডলে বেতার বিক্ষোভ সম্বন্ধে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। স্মৃতিচারণে[10] সতীশরঞ্জন লিখেছেন কি কারণে সত্যেন্দ্রনাথ On the Total Reflection of Electromagnetic Waves in the Ionosphere সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (1938)।

"স্বর্গীয় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা একবার ঢাকায় এসে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে বক্তৃতা দেন। কার্জন হলে তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন সম্পর্কে যেসব গবেষণা নিয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এলাহাবাদে তখন ব্যাপৃত ছিলেন—সেই বিষয়েই ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ-বিষয়ে একটি জটিল সমস্যা সাধারণভাবে সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানান। আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের যে তিনটি নিয়ম-সূত্র বা সর্ত (conditions) অ্যাপলটন দিয়েছিলেন, মেঘনাদ সাহা আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের কোন শোষণ হয় না—এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিফলনের চতুর্থ সর্তের প্রবর্তন করেন। মেঘনাদ সাহা নিজেই জানতেন যে, যে অনুমানের উপর নির্ভর করে এই চতুর্থ সর্তটি তিনি বার করেছেন—সে অনুমান ঠিক নয়। সেই জন্যই বিশেষ কোন

অনুমানের উপর ভিত্তি না করে সাধারণভাবে প্রতিফলন সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি প্রকাশ্য সভায় তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। এই বক্তৃতার পর ক্রমাগত দু-তিনদিন সত্যেন্দ্রনাথ এই সমস্যার সাধারণ সমাধানে গভীর মনোনিবেশ করেন। ফলে এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হন এবং এই সাধারণ সমাধান সম্বন্ধেই তিনি নিবন্ধ রচনা করেন।"

সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসার পর খাস্তগীর ঢাকায় অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। 1948 সালে খাস্তগীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও তার দশ বছর পরে কলকাতায় খয়রা অধ্যাপক হয়ে ফেরেন। তাঁর আগে খয়রা অধ্যাপক পদটিতে সত্যেন্দ্রনাথ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর খাস্তগীর 1963 সালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। 1973 সালে 75 বছর বয়সে খাস্তগীরের মৃত্যু হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ M. Sc. পরীক্ষার external এবং মৌখিক পরীক্ষক হিসেবে নামকরা বিজ্ঞানীদের ঢাকায় আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, বি· বি· রায় ইত্যাদি। অপরাহ্নে চা-সহযোগে দীর্ঘ আলোচনা হত সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে। তার পরে বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকত। এইভাবে ঢাকায় এক বিজ্ঞান ও গবেষণার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ছাত্ররা এই পরিবেশে নিঃসন্দেহে উপকৃত হতেন।

1929 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত শাখার সভাপতিরূপে সত্যেন্দ্রনাথ আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের ধারা[17] সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 1944 সালে The Classical

Determinism and the Quantum Theory সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা আজও বিজ্ঞানী মহলে চিন্তার খোরাক জোগায়। সে বছর তিনি ছিলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা এইভাবে আরম্ভ করেনঃ

"পঞ্চাশ বছর আগে causality এবং determinism সম্বন্ধে আস্থা অটুট ছিল। এখন পদার্থবিজ্ঞানীদের জ্ঞান অনেক বাড়লেও তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন।"[18]

সেই বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন ডি· এস· কোঠারি। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল Cold Dense-Matter, ঘনীভূত পদার্থের ধর্ম ও তাদের জ্যোতির্পদার্থীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডঃ কোঠারী যেসব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যুক্তি প্রদর্শন করেন তার মধ্যে প্রধান ছিল সাহার তাপ আয়ননতত্ত্ব ও বোস-সংখ্যায়ন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ কোনদিনই খুব বড় ছিল না। এখানে একই সংগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ক্লাস নেওয়া হত। এম· এসসি· ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা নয়, দশের বেশি হত না। কাজেই খুব ঘরোয়া আবহাওয়ায় শিক্ষাদান চলত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের অফিস ঘরেই ক্লাস নিতেন। সব চেয়ার ভর্তি হয়ে গেলে আরাম কেদারিটিতেও কাউকে বসতে হত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে একে বলতেন রাজার আসন। ক্লাসের কোন বাঁধাধরা সময় ছিল না। অনেক সময় সারাদিন ধরেই চলত।

1943 সাল নাগাদ ডিপার্টমেন্টে দুজন রীডার ছিলেন—সতীশ-রঞ্জন খাস্তগীর ও কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। লেকচারার ছিলেন আটজন—হরপ্রসাদ মুখার্জি, শশাঙ্কশেখর মুখার্জি, সূর্যকুমার মুখার্জি, কাজি মোতাহের হোসেন, শচীন মিত্র, ভবানী গুহ, ফণী

মিত্র ও সুশীল বিশ্বাস। সেই সময়কার ছাত্রদের কাছে শোনা যায় সত্যেন্দ্রনাথের অবিরত ধূমপান করার অভ্যাস ছিল। একটি চন্দন কাঠের সিগারেট কেস তাঁর টেবিলের উপর রাখা থাকত। এটি তাঁর শাশুড়ী তাঁকে উপহার দেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা দুঃসাহসী তারা প্রায়ই সেই বাক্স থেকে সিগারেট অপহরণ করত। বুঝতে পারলেও এজন্য সত্যেন্দ্রনাথ কখনো অনুযোগ করতেন না। কেবল বলতেন 'আমার জন্যে দু-চারটে রেখে দিস।' ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সহজ ও আন্তরিক।

এই প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়ে থাকে যে যতদিন ঢাকায় ছিলেন ততদিন সত্যেন্দ্রনাথ কাজের মত কাজ কি করেছেন। ছাত্রদের চিন্তাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল, নিজের সুনামের জন্য তাঁর কোন মাথাব্যথা ছিল না একথা বললে অনেকটা মিথ্যা অজুহাতের মত শোনায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই রকমই লোক। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন (এবং তাঁর লিখিত প্রমাণও আছে) যে প্যারিস ও বার্লিনের ল্যাবরেটরীগুলি পরিদর্শন করার তাঁর একটাই উদ্দেশ্য ছিল। তা ছিল এখানে নতুন কি কাজ হচ্ছে তা দেখা, যাতে ফিরে গিয়ে তা ছাত্রদের কাজে লাগান যায়। ছাত্রদের মঙ্গলের দিকে এমন দৃষ্টি তখনকার দিনেও, এমনকি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যেও বিরল ছিল। যে কোন ছাত্র কোন বিষয় বুঝতে না পারলে অসঙ্কোচে তাঁর কাছে চলে আসতে পারতেন। এমন কি গণিতের অধ্যাপক এন· এম· বসুও অনেক সময় ছাত্রদের সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করতেন না কারণ তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে কেউই সঙ্কোচ বোধ করতেন না। তবে দুঃখের বিষয় ঢাকাতে তিনি গবেষণার জন্য খুব উচ্চ স্তরের মেধাসম্পন্ন ছাত্র পেতেন না।

তার কারণ ভাল ছাত্রেরা এম· এসসি· পাশ করতে না করতেই ভাল চাকরী পেয়ে অন্যত্র চলে যেতেন। যে দীর্ঘ সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় কাটান তার মধ্যে মাত্র দু'জন ছাত্র তাঁর কাছে থীসিস সম্পূর্ণ করেন। এঁরা হলেন শচীন মিত্র ও পরিতোষ দত্ত।

ছাত্রদের নিয়ে এত জড়িত থাকার জন্যই এই সময় তাঁর খুবই কম সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে যে কটি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন গোত্রের। যেমন D^2 Statistics, Total Reflection of Electromagnetic waves in the Ionosphere, On Lorentz Group (আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত), On an Integral Equation of the Hydrogen Atom Problem ইত্যাদি—বিষয়-গুলির কোনটিরই পরস্পরের সঙ্গে মিল নেই, বিকিরণতত্ত্ব নিয়ে তিনি পরে আর কাজ করেন নি। অনেকে মনে করেন আইনস্টাইন, যাকে সত্যেন্দ্রনাথ গুরুর স্থান দিয়েছিলেন, এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর উপর খুব একটা সুবিচার করেন নি। আশী বছরের জন্মদিনে যখন সর্বভারতীয় একটি কমিটি কর্তৃক সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তখন তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সম্পর্কে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে শোনা যায়। এই প্রবন্ধটি যে তার প্রাপ্য সম্মানে বঞ্চিত হয়েছিল এই দুঃখ তিনি কোনদিনই ভোলেন নি। A World of Bose Particles[18] নামক প্রবন্ধে ই·সি·জি· সুদর্শন লিখেছেন:

"আমাদের মধ্যে সকলেই বোসের ছাত্র ও অনুগামী। তিনি সর্বদাই আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের মৌলিক চিন্তা স্ফুরিত করেছেন। আমাদের সকলকে যাঁর মনীষার কাছে খর্বাকৃতি মনে হয় তাঁর কথা ভাববার সময় তাঁর সাহস ও মহত্বের কথা আমরা ততটা স্মরণ করি না। কিন্তু যাকে তিনি গুরু বলে মনে করতেন তাঁর উদারতার অভাব ও যোগ্য প্রশংসা থেকে বিরত

থাকা তাঁকে যে খুবই আশাহত করেছিল তাতে সন্দেহ কি। ইলেকট্রোডায়নামিক্স-এ গুপ্তার চমৎকার কাজ এবং কোয়ান্টাম অপটিকস-এ (সুদর্শনের) গবেষণা দুটি তথ্যগত পদার্থবিদ্যায় স্থান লাভ করতে পেরেছে। তিরিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই যে বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কাজটি উপস্থিত করেন অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী তাঁর কাজটির প্রশংসা করার মত উদারতা দেখাতে অক্ষম হন। যে দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা স্বকীয়তাকে চিনে সম্মান দিতে বড় একটা তৎপর হন না সেখানে অন্য সকলের থেকে এগিয়ে থাকা সাহসের পরিচয় বৈকি। সেই রকম একজনের কাছে সত্যেন্দ্রনাথের সাহস ও মহত্ব দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছে।"

কিন্তু পরে যতই মনস্তাপ হোক সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু, ছাত্র ও সহকর্মীদের নিয়ে বড় আনন্দেই ছিলেন। নিজের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। বাড়িতে ছিল চমৎকার বাগান। তাঁর চারদিকে ছিল গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ছাত্রমণ্ডলী। তিনি ছিলেন Dean of the Science Faculty এবং ঢাকা হলের প্রোভোস্ট। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় মহলে তিনি ছিলেন যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের পরে তিনিই উপাচার্য হবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতি মাথা চাড়া দিল। অবস্থা এমন কুশ্রী হয়ে উঠল যে তাঁর পক্ষে সেখানে সসম্মানে বাস করাই অসম্ভব হল। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার প্রস্তাব এল। তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ছাত্ররা বলেন ঢাকায় কর্মজীবনেই তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুখী।

এই সময়ে তাঁর চারটি সন্তানের জন্ম হয়—শোভা 1924 সালে, রথীন্দ্রনাথ 1933 সালে, অপর্ণা 1939 সালে এবং সর্বকনিষ্ঠ

রমেন্দ্রনাথ 1941 সালে।

বারীন্দ্রনাথ মিত্র নামে হাওড়ার এক চিকিৎসকের সঙ্গে কন্যা নীলিমার বিবাহ হয় 1937 সালে। মিত্র খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। পূর্ণিমার বিবাহ হয় 1945 সালে, বর্ধমানের কাছে কুলটিতে ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানীতে মেডিকাল অফিসার ইন চার্জ ডঃ অরুণ রায়ের সঙ্গে। হাসিখুসি স্বভাবের এই জামাইটিকে সত্যেন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন। অরুণ রায় আবার সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। একবার প্যারিস থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জন্য একটি ম্যান্ডোলিন নিয়ে আসেন।

ঢাকার বাড়িতে বাগানে অনেকটা সময় কাটাতেন তিনি গাছপালার চর্চা করে। অনেক সময় দেখা যেত বই নিয়ে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে গান বাজনার আসর বসত, দিলীপ-কুমার রায় ঢাকাতে এলেই তাঁর কাছে আসতেন। অবসর সময়ে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা চলত। গুণী বন্ধুরা কাছেই ছিলেন। এই ধরনের জীবনযাত্রা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে খুবই মনোমত ছিল।

7. কলকাতা (1945—1956)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে আসছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদলের যুগ চলেছে। ঢাকায় তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মল বাতাসকে কলুষিত করে তুলছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমনই যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে নির্বিকার থাকা অসম্ভব। এই আবহাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার মোটেই অনুকূল ছিল না। ঠিক এই সময়েই কলকাতা থেকে খয়রা অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য ডাক এল। অধ্যাপক বিধুভূষণ রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এই পদ শূন্য হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করলেন।

প্রায় পঁচিশ বছর বাদে তাঁর পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন। ইতিমধ্যে সেখানকার পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ মৌলিক গবেষণায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার-জয়ী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন আলোকের বিক্ষেপণ ও সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে এক দল ছাত্রগোষ্ঠী ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। যদিও তাঁর সব কাজই হত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে। দেবেন্দ্রমোহন বসুর চৌম্বকত্ব ও পরমাণু-বিজ্ঞানে গবেষণা, শিশিরকুমার মিত্রের বেতার বিষয়ে আবিষ্কার এই বিভাগের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। যতদিন সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন তার মধ্যে এই বিভাগেও অনেক রদবদল হয়ে গেছে। সি· ভি· রামন চলে গেছেন বাঙ্গালোর,

দেবেন্দ্রমোহন বসু বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কার্যভার গ্রহণ করেছেন, এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসেছেন মেঘনাদ সাহা। অধ্যাপক বি· বি· রায় সুযোগ্য ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক্স-রে গবেষণাগার। সেখানকার যন্ত্রপাতি সবই তাঁদের নিজের হাতে তৈরি। পালিত ল্যাবরেটরীতে ডঃ সুকুমার সরকারের নেতৃত্বে রামন বর্ণালী নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ চলছে। মেঘনাদ সাহা পরমাণু বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়েছেন, বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী সাইক্লোট্রন তৈরিতে ব্যস্ত, নীরজ দাশগুপ্ত প্রাণ পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ঢাকা ছেড়ে চলে এলেন তখন কলকাতার পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ খুব একটা বড় নয়। তিনজন অধ্যাপক ছিলেন—পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ঘোষ অধ্যাপক শিশির মিত্র ও সত্যেন্দ্র-নাথ নিজে খয়রা অধ্যাপক। লেকচারার ছিলেন চারজন—যোগেশ-চন্দ্র মুখার্জি, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দেবদাস ব্যানার্জী ও সুকুমারচন্দ্র সরকার। সত্যেন্দ্রনাথের পুরাতন সহকর্মী শ্রীসুশীলকুমার আচার্য তখন স্পেশাল অফিসার—কাউন্সিল অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিং ইন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির জন্য। পিওর ফিজিক্স বিভাগে নাম করার মত যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডঃ নীরজনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ কুণ্ডু, শ্রীহর্ষনারায়ণ বসু, শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল, ডঃ অজিতকুমার সাহা ও শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর ব্যানার্জী। গবেষণার জন্য বরাদ্দ টাকা ছিল যৎসামান্য। প্রত্যেক অধ্যাপক গবেষণা খাতে খরচ করতে পারতেন বছরে আড়াই হাজার টাকা এবং লেকচারাররা বছরে এক হাজার। গবেষণার জন্য বাড়তি খরচের টাকাটা আসত বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ

অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে।

1945 সালে বিজ্ঞান কলেজের প্রত্যেক বিভাগেই ছিলেন গর্ব করার মত বিজ্ঞানীরা। বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে ছিলেন পালিত অধ্যাপক পদে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। বিখ্যাত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছিলেন ঐ বিভাগেরই ঘোষ অধ্যাপক, প্রিয়দারঞ্জন রায় ছিলেন খয়রা অধ্যাপক। তাছাড়া ডঃ পুলিন-বিহারী সরকার, ডঃ যোগেশচন্দ্র বর্ধন, ডঃ বি· এন· ঘোষ প্রভৃতি নামকরা রসায়নবিদরা ছিলেন লেকচারার।

সেই সময় রসায়ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছিলেন পরবর্তী কালে ভারতের নানা জায়গায় তাঁরা রসায়ন বিভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন রসায়ন বিভাগে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। যাদবপুরের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ বসুও তখন ফলিত রসায়নে গবেষণা করতেন। ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান ছিলেন ঘোষ অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র গুহ। ফলিত গণিতে প্রধান ছিলেন ঘোষ অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন, সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী। ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডঃ পি· এন· ঘোষ।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনে বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা সকলেই আনন্দিত হলেন। খয়রা ল্যাবরেটরীতে তখন ছিলেন দুজন সিনিয়র রিসার্চ স্টুডেন্ট—হর্ষনারায়ণ বসু ও কমলাক্ষ দাশগুপ্ত। পরে হর্ষনারায়ণ বসু খড়গপুর আই· আই· টি-র পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিয়ে solid state physics-এর ভাল গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। কমলাক্ষ দাশগুপ্তের X-ray বিক্ষেপণের কাজ তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। বর্তমানে তিনি টেক্সাসে অস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ঢাকার ছাত্র শিবপদ

ভট্টাচার্য 1945 সালে কলকাতায় এসে খয়রা ল্যাবরেটরীতে কাজ সুরু করেন। ক্রমে আরো কৃতী ছাত্রেরা এসে ল্যাবরেটরী ভরিয়ে তুললেন—যদুগোপাল দত্ত, অপরেশ চ্যাটার্জী, জগদীশ শর্মা, পূর্ণিমা সেনগুপ্ত, বীরেন দত্ত, অমল ঘোষ, লীলা রায় প্রমুখ। এঁরা সকলেই এম· এসসি· শেষ করে formal research student হয়ে নাম লেখান। তবে এঁরা ছাড়াও আসেন রসায়ন বিভাগের আশোক বসু, ফলিত গণিত বিভাগ থেকে পরিমলকান্তি ঘোষ, মহাদেব দত্ত, গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণাংশু রায়, তপেন রায় প্রভৃতি। তবে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য অন্যান্য বিভাগ থেকে আরো যে কত অধ্যাপক ও গবেষকরা আসতেন তার ইয়ত্তা নেই।

কলকাতায় এসে সত্যেন্দ্রনাথ কাজে ভাল করে মন দিয়ে বসতে না বসতেই আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল রাজনৈতিক বিপর্যয়। এক শতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় এমন ভয়াবহ ওলট-পালট আর ঘটেনি। 1946 সালের অগাস্ট মাসে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে গেল তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণা বিপর্যস্ত হয়ে বছর খানেকের জন্য একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞান কলেজ যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই রাজাবাজার প্রধানত মুসলিম এলাকা—দাঙ্গায় এই অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাছাকাছি হোস্টেলে যেসব ছাত্ররা থাকত তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হল। সেই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত পরিবারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞান কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন হল। সুতরাং পড়াশুনোর আবহাওয়া একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল।

এর পরের বছর অগাস্টে এল বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গ-

দেশের পক্ষে এটা ছিল একাধারে সুখ ও দুঃখের কারণ, কেননা বঙ্গভূমির এক টুকরো ভেঙে নিয়ে তৈরি হল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার ফলে শরণার্থী সমস্যা নামে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হল, শিক্ষার পরিবেশেও তার খানিকটা প্রভাব পড়ল।

তবে অন্যান্য বহু অপূর্ণ আশা ও স্বপ্ন অবশেষে, স্বাধীনতার পরে সত্যে রূপায়িত হতে চলল। আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সারা দেশ জুড়ে বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নের এক পরিকল্পনা কার্যকর করতে তৎপর হলেন। কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হল। শান্তিস্বরূপ ভাটনাগর হলেন তার কর্ণধার। দেশের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করতে অথবা উপদেষ্টা হিসেবে আমন্ত্রিত হলেন। কলকাতার বিজ্ঞানী মহলে একটা বড় অংশ এই কাজে এগিয়ে এলেন। মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ, বি· সি· গুহ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই দেশের বিজ্ঞান-নীতি ও ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের রূপ নির্ধারণে অনেক অবদান রেখে গেছেন।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কলেজেও দেখা দিল তৎপরতা। মেঘনাদ সাহার আলাদা একটা পরমাণু বিজ্ঞানের ইনস্টিটিউট গড়ার বাসনা রূপায়িত হল। 1948 সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। Pure Physics department-এর পালিত ল্যাবরেটরী এই নবগঠিত ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সঙ্গে যুক্ত হল। মেঘনাদ সাহা হলেন এর অবৈতনিক ডিরেক্টর। এক সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন গভর্নিং বডি এর পরিচালন ভার গ্রহণ করলেন। তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী ছিলেন সুর রীডার। এই পদটিও নতুন ইনস্টিটিউটে চলে এল।

ঠিক এইরকম ভাবেই Pure Physics বিভাগের ঘোষ লেবরেটরী

ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের Electrical Communication Laboratory আলাদা করে তৈরি হল Institute of Radio Physics and Electronics. এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Technology faculty-র একটি পৃথক বিভাগরূপে গণ্য করা হল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন শিশিরকুমার মিত্র, যিনি ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসর অফ ফিজিক্স, সুতরাং বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে বাকী রইলেন কেবলমাত্র খয়রা অধ্যাপক। এই পরিস্থিতি বেশ কিছুদিন চলেছিল। মেঘনাদ সাহা যখন পালিত অধ্যাপক পদ ছেড়ে দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ডিরেক্টরের পদ নিলেন তখন বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী হলেন পালিত অধ্যাপক। সাহার মৃত্যুর পর (ফেব্রুয়ারী 1956) নাগচৌধুরী সাহা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হলেন। পালিত অধ্যাপক পদটি 1958 সালে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ফিরে গেল। 1957 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে Professor of Chemical Physics নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি হয়। ডঃ সুবোধ বাগচী কয়েক বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর আমেরিকা চলে গেলে এই পদটিও লুপ্ত হয়।

অধ্যাপক বোস আসার আগেই খয়রা ল্যাবরেটরীতে গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। এক্স-রে কেলাসবিদ্যা সংক্রান্ত কাজে ইতি-মধ্যেই এখানকার বেশ সুনাম হয়েছে। হর্ষনারায়ণ বসু ও তাঁর ছাত্ররা তাপজনিত প্রতিপ্রভা নিয়ে নতুন ধরনের কাজ করছিলেন। এখন সত্যেন্দ্রনাথের অধীনে সেই কাজ আরো ভালভাবে এগুতে লাগল। নানারকম ফলিত শাখায় গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হতে লাগল। ধাতু ও বিভিন্ন কাদামাটি সংক্রান্ত কাজও তার মধ্যে ছিল।

প্রথম কয়েক বছর নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। 1945 থেকে

'48 পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হল। এ-বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ আলাদা একটি অধ্যায়ে করা হবে। 1948 থেকে '50 সত্যেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সভাপতি হলেন। সংস্থাটির নাম বদলে এখন হয়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স আকাদেমী। ঐ সময়, অর্থাৎ 1947 থেকে '55 সালের মধ্যে অনেক নামকরা বিজ্ঞানী বিদেশ থেকে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পি· এ· এম· ডিরাক এবং জে· ডি· বার্নাল।

যদিও প্রধানত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যাই তাঁর বিষয়, তবু, সত্যেন্দ্রনাথ সারা জীবনই পরীক্ষাগত দিকটিতেও সমান উৎসাহী ছিলেন। 1954 সালে প্যারিসে যে Creptallographic সম্মেলন হয় উনি তাতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর ছাত্ররা যে thermoluminescence analyser উদ্ভাবন করেন এটি তারই বিবরণ। 1951 সালের থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি বছরই ইউরোপ গিয়েছেন। আবার আর একবার তাঁর প্রতিভার চমক দেবার সময় আসন্ন হল।

অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানী মহলে চেষ্টা চলছিল এমন একটি একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) উদ্ভাবনের যার দ্বারা সাধারণ আপেক্ষিকবাদ ও তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব দুটিরই ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আইনস্টাইন নিজেই এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন। অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা—যেমন হার্মান ওয়াইল, এডিংটন, শ্রয়েডিংগার, কালুজা ইত্যাদিরাও এদিকে মনোযোগ দেন। কলকাতা বিজ্ঞান কংগ্রেস চলাকালে বিজ্ঞান কলেজের একতলায় সত্যেন্দ্রনাথের অফিস ঘরে বসে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমস্যাটা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করল, কেমন এই সমস্যা যা নিয়ে নামজাদা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে চলেছে অথচ কোন যুক্তিগ্রাহ্য

সমাধানে পৌঁছতে পারছেন না? 1950 থেকে 1955 সালের মধ্যে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্ত উপস্থিত করলেন। এগুলিতে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং স্বকীয়তার ছাপ ছিল স্পষ্ট। এই প্রবন্ধগুলি ঐ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান সংযোজন বলে গণ্য হয়েছে।

1952 সালে মেঘনাদ সাহা কলকাতার একটি এলাকা থেকে লোক-সভায় নির্বাচিত হলেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক মহলে খুবই সাড়া পড়ে যায়। সেই বছরই সত্যেন্দ্রনাথ রাজ্যসভায় মনোনয়ন পান। 1958 পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন। 1954 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

1952 সালে 62 বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিলেন। এর পর তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। সেই সময় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে full-time শিক্ষক ছিলেন মাত্র চারজন—ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ কমলাক্ষ দাশগুপ্ত এবং ডঃ সুধাংশু দত্ত-মজুমদার। তবে এম· এসসি· ক্লাসে পড়াবার জন্য আসতেন সাহা ইনস্টিটিউট এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনেকে।

প্রায় ছাব্বিশ বছর বাদে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ইউরোপে যান। এর আগে 1927 সালে তিনি নিমন্ত্রণ পেয়েও একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য যেতে পারেন নি। ইতালীয় সরকার আলিসান্দ্রো ভোল্টার জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিলেন। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে আহূত হয়েছিলেন এলাহাবাদ থেকে ডঃ সাহা ও কলকাতা থেকে অধ্যাপক বোস। টেলিগ্রামে শুধু 'প্রোঃ বোস' এই টুকু উল্লেখ ছিল। কোন বোস সেকথা বলা ছিল না। কলকাতায় প্রোঃ বোস বলতে বোঝাত

দেবেন্দ্রমোহন বসুকে। সুতরাং তিনিই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চলে গেলেন। পরে জানা গিয়েছিল আমন্ত্রণ ছিল সত্যেন্দ্রনাথ বোসের। ভুল করে কলকাতা লেখা হয়েছিল।

1953 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বুদাপেস্টে যান নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে। সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকেও আমন্ত্রণ এসেছিল, সত্যেন্দ্রনাথ এই সুযোগে জেনিভা, প্যারিস, কোপেনহাগেন, জুরিখ এবং প্রাগও ঘুরে এলেন। জুরিখে তাঁর সঙ্গে প্রোঃ পাউলি ও কোপেনহাগেনে নীলস বোরের দেখা হয়।

পরের বছর ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্যারিসে আন্তর্জাতিক ক্রিস্টালোগ্রাফি সম্মেলনে যান। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে ফ্রান্স ও ফরাসী জীবন-যাপন প্রণালীর অনুরাগী ছিলেন। 1955-এ তিনি আবার প্যারিসে যান। এবারে ফ্রান্সের কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক রিসার্চ তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-বাদের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি। বার্নে সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল কারণ এখানেই আইনস্টাইন ব্রাউনীয় গতি, ফোটন তত্ত্ব ও বিশেষ আপেক্ষিকবাদ তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন। যে ধারণার ফলে বিজ্ঞানজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের পক্ষে বার্নই ছিল সবচেয়ে যোগ্য জায়গা। জুলাই মাসে সম্মেলন হবার কথা ছিল। আইনস্টাইন এই সভায় আসবেন ঠিক ছিল। Unified Field Theory সম্বন্ধে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা করবেন সত্যেন্দ্রনাথ এই মনে করে বার্নে যান। এই থিওরী নিয়ে তিনি কাজ করছিলেন তবে এর অনেকগুলি বিষয়ের সমাধান তখনো বাকি। দুর্ভাগ্যের বিষয় আইনস্টাইনের মৃত্যু

হওয়াতে এই সাক্ষাৎ আর শেষ অবধি ঘটে ওঠেনি।

এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ 1956 সালে ইংলন্ডে যান বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে। বছর দুই বাদে তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে আবার আসেন। তখন তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন।

1962 সালে তিনি সুইডেন যান এবং সেখান থেকে যান মস্কো, শান্তি সম্মেলনে। সেই বছরই অগাস্ট মাসে তিনি জাপানে আমন্ত্রিত হন বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের স্মৃতিতে এই সভা আয়োজিত হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ কখনো চীনে যাননি, যদিও একবার যাওয়া প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। 1952 সালে ভারত থেকে একদল শিক্ষক চীন দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। এই দলে যোগ দিতে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয়। প্রথমে তিনি সম্মত হন। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে মাত্র সাত দিনের মধ্যে দ্রুত ভ্রমণ পরিসমাপ্ত করে ফিরে এসে তাঁদের চীন দেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় বলতে হবে। সেই শুনে সত্যেন্দ্রনাথ আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন যে দেশে যাওয়ার কথা সেখানকার ভাষা জানি না। সেই দেশবাসীর প্রকৃতিও অজানা। শুধু কয়েকটি মিটিংয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াকে কি অভিজ্ঞতা বলা যায়?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও কখনো যাওয়া হয়নি তাঁর। একবার একজন মার্কিন লেখক ভারতে তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সত্যেন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেন, 'আপনাদের সেনেটর ম্যাকার্থি হয়ত আপত্তি করতেন। আমি আগেই সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরে

এসেছি যে।'

1945 সালে ঢাকা থেকে ফেরার পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছুদিন 20, ঈশ্বর মিল লেনে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে ছিলেন। পরে তিনি গুরুসদয় দত্ত রোড ও প্রমথেশ বড়ুয়া সরণীর সংযোগস্থলে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে চলে আসেন। আরো পরে তিনি নিউ আলিপুরে অন্য একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করেন।

পিতা হিসেবে তিনি মোটেই প্রভুত্বপ্রিয় ছিলেন না। সাংসারিক ব্যাপার সবটাই তাঁর স্ত্রী ও পিতার উপর ছাড়া ছিল। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। বয়সের তুলনায় যথেষ্ট কর্মক্ষম ছিলেন তিনি। তিনি পুত্রের সপ্ততিতম জন্মদিন দেখে যেতে পেরেছিলেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক ছিল বড় মধুর। সকাল বেলায় বেরিয়ে যাবার আগে পুত্র একবার পিতার ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন করতেন, তাঁর জন্য এক টিন সিগারেট রেখে যেতেন। সেই সময় গুরুজনদের সামনে ধূমপান করার রেওয়াজ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু পিতার সামনেই সিগারেট খেতেন। তাতেই বোঝা যায় তাঁদের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের একজন ভাগ্নে বলেছেন তাঁর ছোটবেলায় দেখা একটি বিশেষ দৃশ্যের কথা, পিতা ও পুত্র তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন, সামনে এক টিন সিগারেট। দুজনেই তার থেকে সিগারেট নিয়ে ধূমপান করছেন ও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁদের বাড়ির পরিবেশ ছিল অত্যন্ত ঘরোয়া। ছেলে-মেয়েদের কোনরকম শাসনের মধ্যে রাখা হত না, এমন কি খাওয়া-দাওয়াও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। 1949 সালে তাঁর তৃতীয়া কন্যা জয়ার বিবাহ হয় কলকাতা হাই কোর্টের ব্যবহারজীবী দেবপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে। চৌধুরীরা পার্ক সার্কাসে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে বাস করেন।

৪. শান্তিনিকেতন পর্ব (1956—1958)

1951 সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল। প্রধানমন্ত্রী হলেন আচার্য। 1956 সালে উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মৃত্যু হবার পর সত্যেন্দ্রনাথকে এই পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ খয়রা অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। 1956 সালের জুলাই মাসে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগদান করলেন। যতদিন তিনি কার্যভার গ্রহণ করেননি ততদিন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী সাময়িকভাবে উপাচার্যের কাজ চালান। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী তখন অসুস্থতার জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ইতিমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ছেলে রথীন তখন কর্মরত। ছোট রমেন বেলুড়ে হোস্টেলে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে।

নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানিয়ে 'বিশ্বভারতী নিউজ' লিখল 'আমরা আশাকরি প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব আমরা তাঁর মধ্যে পাব।'[19ক]

কালবিলম্ব না করে সত্যেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়লেন। প্রথম সপ্তাহেই তিনি বিভাগীয় প্রধান ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলেন। কর্মিমণ্ডলী এবং উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা করলেন। 'এই প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের নতুন

উপাচার্য সব সময়েই এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি অব্যাহত রেখে সকলের চেষ্টায় ঐসব উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্রতী হতে হবে।' এই মন্তব্য করে বিশ্বভারতী নিউজ।

বিশ্বভারতী যেসব আদর্শের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত তার একটি হল গুরু-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ঢাকা এবং কলকাতাতে সত্যেন্দ্রনাথ দরদী শিক্ষক হিসেবে সুবিদিত ছিলেন। ছাত্রদের তিনি তুই সম্বোধন করতেন। তাঁকে কেউই ভয় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকত না। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন কোন বাঁধাধরা সময়ের হিসেব থাকত না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি সকলের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু পরিচালন নীতি ঘটিত ব্যাপারে বদলের প্রচেষ্টা করতে গিয়ে তিনি ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নতুন আইডিয়াকে এখানে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর এই ধারণাগুলি শান্তিনিকেতনের বাঁধাধরা ছকের সঙ্গে খাপ নাও খেতে পারে। কাঁচের মন্দিরটি মাত্র সপ্তাহে একদিন উপাসনার জন্য ব্যবহার হয় এটা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এই চমৎকার স্থানটি অন্য কাজেও ব্যবহার করা উচিত। তিনি একজন প্রবীণ শিক্ষকের কাছে প্রস্তাব করেন—এই ঘরটিকে রীডিং রুম করলে কেমন হয়? শুনে শিক্ষকটি স্তম্ভিত হন। কোন শান্তিনিকেতনবাসীর কাছে তাহলে যে মন্দিরের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। শুনে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ হলেন। এই নিয়ে তিনি পরে আর অগ্রসর হবার চেষ্টা করেননি। আসল কথা হল বিশ্বভারতীর বাইরের লোকেদের গ্রহণ করতে একটা অনীহা আছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলিও তাই তাঁদের

কাছ থেকে কোন সমর্থন পায়নি।

সমস্ত পাঠক্রম ঢেলে সাজাবার এক পরিকল্পনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ। বিজ্ঞান পাঠক্রম আরম্ভ করারও প্রস্তাব দেন তিনি। বিশ্বভারতীতে কেবল ইন্টারমিডিয়েট অবধি বিজ্ঞান কোর্স চালু ছিল এতদিন। তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিনটি ধাপে পাঠক্রমে ভাগ করা হয়েছিল; প্রথম পর্যায় ছিল ছয় বছর থেকে এগারো বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই পর্যায় শেষ হবে প্রাইমারী স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায়। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল এগারো থেকে সতেরো বছর বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই পর্যায় শেষ হবে হায়ার স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায়। এর মান হবে বর্তমান ইন্টার-মিডিয়েটের সমান। এর পরের, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব হবে সতেরো থেকে বাইশ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রস্তুত করা হবে তাদের এই পর্যায় শেষ হবে বি· এ· অনার্স ও এম· এ· ডিগ্রীর পরীক্ষায়। নতুন পদ্ধতিতে ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি· এ· পাস পরীক্ষা বাতিল হল। আধুনিক ও প্রাচীন সমস্ত ভারতীয়, এশীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় শিক্ষণের ব্যবস্থাও নতুন পাঠক্রমে ছিল।

এই পরিবর্তন পাঠক্রমে একটি নতুন বিজ্ঞান-ভবন স্থাপনের পরি-কল্পনাও ছিল। এখানে ভৌত ও প্রাণী বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণা হবে। ছয়টি পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ ফেলোশিপ-এর ব্যবস্থা করা হল—বিজ্ঞান ও কলা মিলিয়ে। 'বিশ্বভারতী নিউজে' লেখা হল 'অধ্যাপক বসুর পরিকল্পনা সংসদ ও কর্মী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কাজে রূপায়িত হবে আশা করা যায়।'[19]-খ

বিশ্বভারতীতে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 1957 সালের সমাবর্তন ভাষণেও বলেন। তিনি বলেন আধুনিক সংস্কৃতিবান মানুষের প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত থাকা তার চরিত্র গঠনে অপরিহার্য। ছাত্রদের তিনি প্রায়ই প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিতেন। পরীক্ষামূলকভাবে রান্নাঘরের আবর্জনাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস উৎপাদনের জন্য তিনি একটা পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেন। এতে সারও উৎপন্ন হতে পারত এবং স্কুল ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত মিথেন গ্যাসও পাওয়া যেত। কর্মী সমিতি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং এর জন্য 2000 টাকাও দেন।

কিন্তু বাধা ছিল দুস্তর। বিরোধীরাও ছিলেন শক্তিশালী। এক বছরের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লেন। 1958 সালের 28 মার্চ এফ· আর· এস· হওয়া উপলক্ষে যখন আম্রকুঞ্জে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তখন উত্তরে তিনি বলেন। "মনে পড়ে আমার গুরু জগদীশচন্দ্র বসুর কথা, যিনি আমাদের দেশে বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ। আমিও সারাজীবন ঐ একই পথের সাধনা করেছি.........এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় আপনাদের সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাসগুলিতে যদি কিছু সাহায্য করতে পারতাম। যদিও এখানে বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানচর্চার খুব একটা সুবিধে নেই।" এই কথাগুলি বিনয়ের সঙ্গে বলা হলেও যেন পরাজয়ের বিষন্ন স্বীকৃতি। এই লোকটি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু খানিকটা নিজের অক্ষমতায় ও খানিকটা পরিস্থিতির বিপর্যয়ে সেই স্বপ্ন শেষ অবধি রূপায়িত করতে পারলেন না।

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনস্বীকার্য যে সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

অথচ এমন হওয়া উচিত ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে তাঁর মানসিকতায় মিল ছিল। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সৌহার্দের। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথও অল্প বয়সে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। স্যার আশুতোষের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই—যে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট দূর-দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও আশুতোষ বাংলা ভাষাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে অবহেলা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক বই বিশ্বপরিচয় সত্যেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেন।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের সভাপতি হয়েছেন। পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন, পদ্মবিভূষণ উপাধি পেয়েছেন। এই সময়ে নানা দিক থেকে নানা সম্মান বর্ষিত হতে থাকে। 1957 সালে কলকাতা, যাদবপুর ও এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেন। সেই বছর ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি। যেসব সম্মান বহুকাল আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল এখন সেগুলি আসতে লাগল। 1958 সালে তিনি অবশেষে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। সেই বছর শিশিরকুমার মিত্রও এই সদস্যপদ পান। 1959 সালে দেশ বিজ্ঞানীকে যে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে পারে তিনি তাই লাভ করেন, জাতীয় অধ্যাপক হন। 1961 সালে যখন তিনি বিশ্ব-ভারতী ছেড়ে চলে গেছেন তখন বিশ্বভারতী তাঁকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেশিকোত্তম এই উপাধিতে ভূষিত করে।

বিশ্বভারতীতে তাঁর অল্পদিনের কার্যকাল শেষ হল। আবার তিনি কলকাতার বিজ্ঞানজগতে ফিরলেন। তখন 1959 সাল। বন্ধু, ছাত্র ও অনুগামীরা এতে খুবই আনন্দিত হলেন। ঐ সময়

বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে কর্তব্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সেগুলি থেকে অব্যাহতি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছেন। জীবনের শেষ দিনগুলি হয়ত নির্বিঘ্নে গবেষণায় অতিবাহিত করা যাবে।

9. গতানুগতিকতার বাইরে

সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা। পাঁচটার মধ্যেই উঠে পড়তেন তিনি। নিজেই দু-কাপ চা করে খেতেন, তারপর পড়তে বসতেন। প্রায় দু ঘণ্টা চলত এই পড়াশোনা। বাড়ির কাজকর্ম সুরু হবার পর তিনি স্নান সেরে নিয়ে সারা দিনের জন্য প্রস্তুত হতেন। নিজের ঘরে পেঁ'ছে আর এক প্রস্থ চা খাওয়া। অতঃপর কাজ আরম্ভ হত। কঠিন পরিশ্রম করতেন তিনি, যদিও একটু খাপছাড়াভাবে। যখন কোন নতুন সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পেঁ'ছতেন তখন তিনি কারো সঙ্গে দেখা করতেন না।

এই সময় সাধারণত তিনি তাঁর আজীবনের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট নগেন কালীকে বলে দিতেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। বাকিটা নগেন কালীই দেখতেন। বিশ দশকে নগেন কালী ছিলেন মোহনবাগানের খ্যাতনামা গোলরক্ষক। কালী সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন, তাঁর খামখেয়ালী স্বভাবের সঙ্গেও তিনি ভালই পরিচিত ছিলেন। যথেষ্ট যত্ন সহকারে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু এইরকমভাবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গভীর অভিনিবেশ সহকারে কাজের ঝোঁকটা বেশি দিন চলত না। সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর তিনি আবার আগের মতই বন্ধু-বান্ধবদের গল্পগুজব, চা-জলখাওয়ার দিয়ে আপ্যায়ন ইত্যাদি সুরু করে দিতেন। তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছেই নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত।

বাড়ি ফিরতেন দেরী করে। কিন্তু যখনই ফিরতেন এসেই তিনি খেয়ে নিতেন। তারপর শুয়ে পড়তেন। ন'টা নাগাদ উঠে পড়ে আবার বই-খাতা নিয়ে বসে যেতেন। সমস্যাটা হয়ত গণিত সংক্রান্ত, কিংবা হয়ত এমন কোন ব্যাপার যার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান বা গণিতের কোনই সম্পর্ক নেই। সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে তিনি শেষ বয়সে অনেক চিন্তা করেছেন। চতুর্থ কন্যা পটলকে অঙ্ক করাতে গিয়ে এই সমস্যাটা তাঁর মাথায় আসে। জীবনের শেষ কটি দিন তিনি এই নিয়েই কাজ করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁর টেবিলের উপর যেসমস্ত অসমাপ্ত অঙ্ক দেখা যায় তা এই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়েই।

যে কোন কারণেই হোক সাধারণ লোকের মনে সত্যেন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি আছে তা হল একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির, যিনি ছিলেন পরিশ্রমে বিমুখ এবং অধিকাংশ ক্ষমতাই যিনি অপব্যয় করেছেন বৃথা গালগল্পে। কিন্তু সত্যিকার সত্যেন্দ্রনাথ এমন ছিলেন না। তাঁকে দেখে অত্যন্ত ঢিলেঢালা প্রকৃতির মনে হত বটে কিন্তু তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ছিল অন্যরকম।

খোলা কাগজে তিনি অঙ্ক কষতেন এবং সেই কাগজগুলি যত্ন করে গুছিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি বাঁধানো খাতায় তুলে রাখতেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লেখা পান্ডুলিপি সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত উৎসাহের অবসান ঘটত। সেই বিষয়টি নিয়ে তিনি আর ভাবতেন না। কাজেই সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে কুড়ি বছর ধরে তিনি যা ভেবেছেন তা কোনদিন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে পেল না।

তবে তাঁর চরিত্রের অন্য কয়েকটি দিক ছিল যা তাঁকে কিংবদন্তীতে পরিণত করতে সাহায্য করেছে।

1947 সালের দুপুরবেলা একদিন মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান কলেজে

সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকলেন। একটি মিটিংয়ে উপস্থিত হবার কথা ছিল দুজনের। পাশের ঘর থেকে কয়েকজন রিসার্চ স্কলার তাঁদের কথোপকথন শুনতে পান। মোটামুটি এইভাবে কথাবার্তা হয়েছিল—

সাহাঃ সত্যেন, মিটিঙে আসছিস না?

বোসঃ মিটিঙ! ভেতরে আয়।

বাজনা শুনবি, এই লোকটা বাঁশীতে বেহাগ বাজাবে।

সাহা একবার মাত্র বন্ধুর দিকে তাকালেন, তারপর হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বংশীবাদক বাজনা আরম্ভ করল। সত্যেন্দ্রনাথের মন থেকে মিটিঙের সমস্ত চিন্তা ততক্ষণে অন্তর্হিত। সঙ্গীত, বন্ধুদের সান্নিধ্য, বই এবং সুখাদ্য—জীবনের এইসব উপভোগ্য বস্তুগুলির প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। এগুলি উপভোগ করার জন্য তিনি সময়ের কোন বাছ-বিচার করতেন না।

তাঁর এইরকম খামখেয়ালী স্বভাবের বহু উদাহরণ আছে। এর অনেকগুলি গল্প এখন লোকের মুখে মুখে ফেরে। একবার একটি ছাত্র ভাল সেতার বাজায় শুনে সত্যেন্দ্রনাথ তাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন।

'আমাকে বাজিয়ে শোনাবি।'

ছাত্রটি এই অযাচিত সম্মানে অভিভূত। 'আপনার বাড়ি গিয়ে একদিন বাজাব স্যার?'

'না, এখানে নিয়ে আয়।'

তখনি সেতার আনা হল। তবলা-বাদককেও খবর দেওয়া হল। দু'জনে মিলে বিশাল ল্যাবরেটরী টেবিলের উপর চড়ে বসল, কারণ, ঘরে আর জায়গা ছিল না। বাজনা সুরু হল।

সঙ্গীতের সমঝদার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

অনেক সময়ে গানবাজনার আসরে দেখা যেত তাঁর চোখ বন্ধ। লোকে মনে করত তিনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সংগীত শেষ হতেই তিনি চোখ খুলে এমন সব প্রশ্ন আরম্ভ করতেন যার থেকে বোঝা যেত তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই সমস্ত কিছু শুনেছেন।

আশী বছরের জন্মদিনে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ডিরেক্টর তাঁর এক সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার জন্য তাঁর বাড়িতে যান। সমস্ত ব্যাপারটিতে সত্যেন্দ্রনাথ খুব কৌতুক অনুভব করছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভংগীতে তিনি মন্তব্য করেন 'এসব কান্ড-কারখানা কিসের জন্যে? কি করতে হবে? তোমাদের সুখ্যাতি করতে হবে? কিন্তু প্রাচীন বাংলা গান বলে তোমরা যেসব গান দিচ্ছ—' কথাটা উনি শেষ করলেন না। বোঝা গেল বৃদ্ধ বয়সেও সংগীত সম্পর্কে তিনি ঠিক আগের মতই সজাগ।

তিনি এসরাজ বাজাতেন একথা সকলেই জানে। কিন্তু তিনি বাঁশীও বাজাতেন সেটা বেশি লোকে জানেন না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীতে প্রীতি। লোকগীতি থেকে আরম্ভ করে ক্লাসিকাল, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সব রকম সংগীতেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তাঁর বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ভারতীয় সংগীতের উপর তাঁর বইটি লিখছিলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি অনেক সাহায্য পান। ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন, বিজ্ঞানী না হলে তিনি হয়ত খুব বড় সংগীতবিশারদ হতে পারতেন।

প্রথম গবেষণাপত্রটি বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। সেটা ছিল 1924 সাল। এর পরের উল্লেখযোগ্য কাজ প্রকাশিত হয় 1934 সালে। এই সময়টা তিনি কি করছিলেন? বিশ্রাম নিচ্ছিলেন কি? এই প্রশ্নটি সর্বদাই করা হয়। আসলে প্রকাশিত

গবেষণাপত্র দিয়ে বিচার করতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের কাজ খুবই কম— তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ সারাজীবনে মাত্র পঁচিশটি। এইজন্য অনেক সময় তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই জাতীয় প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। তবে আসল কথা হল সত্যেন্দ্রনাথ এমনই এক ব্যতিক্রম যে সাধারণ মাপকাঠিতে, প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সংখ্যা দিয়ে তাঁকে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত বিচার করতে যাওয়া তাঁর প্রতি অবিচার করা।

যে কোন বৈজ্ঞানিকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করা। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু এই লক্ষ্যটাকে খুব বড় করে দেখেননি। স্মরণ করা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কখনো ডক্টরেটের জন্য থীসিস লেখেননি এবং ডক্টরেট ডিগ্রী সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোন আকাঙ্খা ছিল না। এটা ছিল তাঁর ছাত্রদের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তাদের কাছে থীসিস দেওয়া ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে তারা এই ব্যাপারে বড় একটা উৎসাহ কখনই পায়নি। তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণই ছিল আসল কথা। ডক্টরেটের থীসিস অত্যন্ত গৌণ। সম্ভবত এই কারণেই সত্যেন্দ্র-নাথের কাছে যারা পিএইচ· ডি· করেছে তাদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়।

প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা অল্প হওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় যে তাঁর জ্ঞানের পরিধিও ছিল সীমাবদ্ধ। বরং ঠিক তার বিপরীত। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের চেয়ে তাঁর মনীষা ছিল তীক্ষ্ণতর এবং তাঁর কৌতূহলের পরিধি ছিল অনেক বেশি বিস্তৃত।

যদিও তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদ কিন্তু খয়রা অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জৈব রসায়নের ল্যাবরেটরী গড়ে তুললেন। ঢাকাতেও তিনি এই বিষয়ে

ল্যাবরেটরী করেছেন এবং রসায়নবিদদের সঙ্গে যুক্তভাবে গবেষণা করেছেন। ঢাকাতে তাঁর কাছে ডক্টরেট করেন পরিতোষ দত্ত। তাঁর বিষয় কিন্তু ছিল রসায়ন। 1946 সালের পর থেকে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে structure and stereo-chemistry of several alkaloids and other organic substances নিয়ে কাজ করেন। এ বিষয়ে অসীমা চট্টোপাধ্যায় নিজেই লিখেছেনঃ

"অধ্যাপক বোসের আর একটি প্রধান অবদান inorganic complex salt এবং clay minerals নিয়ে কাজ।....অধ্যাপক বোস ও তাঁর ছাত্ররা কাজ আরম্ভ করার আগে আমাদের দেশে এই নিয়ে বিশেষ কাজ হয়নি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় clay সৃষ্টি হয় তাই যেসব অঞ্চলে আগে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি সেই সব জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল তাঁদের কাজের পক্ষে খুবই জরুরী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা এইসব নমুনা বিশ্লেষণের জন্য তাঁরা নিজেরাই ল্যাবরেটরীতে microfocus X-ray tube এবং differential analyser তৈরি করেন।[20]

1924 সালের পর তাঁর দীর্ঘ নীরবতার নানা জনে নানা অর্থ করেছেন। বি· এম· উদগাঁওকর বলেনঃ[21]

"ক্ষুদ্রমনাদের কাছে মনে হতে পারে তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। কিন্তু আসলে তখন তাঁর সদাজাগ্রত, সদা কৌতূহলী মন নানা বিষয়ে চিন্তা আরম্ভ করেছে। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও তিনি রসায়ন, জীব-বিজ্ঞান, মৃত্তিকা ও ধাতু বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, চারুকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন তখন। তারপর তিরিশ বছর বাদে, 1953—55 সালের মধ্যে, যখন তাঁর বয়স ষাট তখন আর একবার

তাঁর প্রতিভার দীপ্তি স্ফুরিত হল। একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি প্রমাণ করলেন যে তাঁর গাণিতিক ক্ষমতা তখনও এতটুকু ম্লান হয়নি।"

ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী বলেনঃ[21]-ক

"নতুন সমস্যা সমাধান করার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উত্তর জীবনে তিনি জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। রসায়নে তাঁর উৎসাহ কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেবল উপদেশ দেওয়া বা পথনির্দেশ করা ছাড়াও তিনি sulphonazide অণুর গঠন নিয়ে নিজে গবেষণা করেন।

সম্ভবত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ যা তাঁকে সকলের প্রিয় করেছে তা হল জীবন সম্বন্ধে অখণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী। অবসর যাপন ও বন্ধুদের সান্নিধ্য ছিল তাঁর কাছে মন ও বুদ্ধি চর্চার বৃহত্তর জগতের একটি অংশ। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর চরিত্রের সীমাবদ্ধতাও এই। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন লোক যিনি জীবনকে তার সম্পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের ও নিজের বিশেষ বিজ্ঞান-শাখার স্থান খুবই ছোট।"

লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় শান্তিনিকেতনে একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাড়ি গিয়েছেন। দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ মশারী খাটিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছেন। অসুস্থ কিনা জানতে চাইলেন অন্নদাশঙ্কর। না, সেরকম কিছু নয়। মশার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি পড়ায় মন দিতে পারছিলেন না। কি সেই বই যা তিনি এত মন দিয়ে পড়ছেন? বইটি আফগানিস্তানে সদ্যোপ্রাপ্ত অশোকের আরামিক লিপিতে লেখা অনুশাসন সম্বন্ধে। অন্নদাশঙ্কর নিজেও প্রচুর বই

পড়েন, কিন্তু তিনি তখনো এই অনুশাসনের কথা শোনেননি। আর একদিন তিনি গিয়ে দেখেন সত্যেন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগ সহকারে সংস্কৃতে চারুদত্ত পড়ছেন।[22]

তাঁর ছাত্র গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:[23]

"পথ যদি উদ্দেশ্যহীন বা লক্ষ্যহীন হয় তবেই তাকে এলোমেলো বলা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, নির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল, নিজের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি বাড়াবার জন্য যে ধরনের অভ্যাস ও পদ্ধতি অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও আয়ত্ত করে থাকেন সেগুলি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একান্তভাবে নিরাসক্ত, এইসব অভ্যাস ও পদ্ধতি থাকা যে ভাল নয় সে কথা যথার্থ নয়। এগুলি আয়ত্ত করার জন্য যে চেষ্টা দরকার সেটি সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবে ছিল না।"

এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন:[24]

"আমরা যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি অথবা তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি তারা জানে যখন কোন সমস্যা তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জের মত মনে হত তখন তিনি তার সমাধানের কাছাকাছি না পৌঁছন পর্যন্ত স্থির থাকতে পারতেন না। এটা হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি সে বিষয়ে আর মোটেই চিন্তা করতেন না। এমনকি টুকরো কাগজে তিনি যেসব নোট নিতেন সেগুলি এক-সঙ্গে করে গুছিয়ে লিখে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করার কোন চেষ্টাই করতেন না, যদিও সমস্ত গবেষকরা এইরকমভাবে সিদ্ধান্তটি গুছিয়ে সাজিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা ও কলকাতায় শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল, কিন্তু তিনি কখনো যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন সেই বিষয়ের নোট রাখতেন না। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন বা কথাবার্তা কইতেন তার মধ্যে থাকত রসিকতাবোধ,

চিন্তা উদ্দীপ্ত করার শক্তি এবং সরলতা। দুঃখের বিষয় তার বিশেষ কিছুই রেকর্ড করা হয়নি। ফলে এই মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের অনেকটা অংশই উত্তরকালে বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা।”

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পি· এ· এম· ডিরাক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। একদিন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই গাড়িতে তাঁরা কোথাও চলেছেন। তাঁরা ছিলেন পিছনের আসনে। সামনের সিটে ড্রাইভার ও সত্যেন্দ্রনাথ। তা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে সামনের আসনে উঠে আসতে বললেন। ডিরাক একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, বড্ড ঠাসাঠাসি হবে না? সত্যেন্দ্রনাথ পিছন ফিরে বললেন, আমরা বসু সংখ্যায়নে বিশ্বাস করি। ডিরাক তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন, বসু সংখ্যায়নে মৌল কণাগুলি খুব ঠাসাঠাসি করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রসিকতার ভঙ্গীতে ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ কখনো নিজের কাজের উল্লেখ করতেন না।

তাঁর ঘর ছিল সকলের কাছে অবারিত দ্বার। তিনি আদব-কায়দার বড় একটা ধার ধারতেন না। তাঁর কলকাতার বাড়িতে যে ঘরটিকে তিনি একই সঙ্গে শোবার ও পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন সেখানেই সকলের সঙ্গে দেখা করতেন। সর্বদাই তাঁর কাছে লোক সমাগম হত। তারজন্য আগে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার প্রয়োজন ছিল না। যখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে খয়রা অধ্যাপক তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সুইং ডোর ‘ঠেলে ঢুকে পড়লেই হত।’[25]

যৌবনে অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন তিনি। অল্প বয়সেই তাঁর চুল পেকে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি রূপবান ছিলেন। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে সৌম্য মূর্তি। পাজামা-কুর্তা পরিহিত, বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ। এক মাথা অবিন্যস্ত সাদা চুল, ভারী চেহারার এই

লোকটিকে সভা-সমিতিতে প্রায়ই দেখা যেত। অথচ দর্শকদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানতেন বোস-সংখ্যায়ন বলতে ঠিক কি বোঝায় অথবা পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান কি। তাদের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আস্থা ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। তাঁর উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথ ভাল জামাকাপড় পছন্দ করতেন। টুপী ও ছড়ির সংগ্রহ ছিল তাঁর। অনেক সময় তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদের অদ্ভুত রুচি অন্যের কৌতূহল উদ্রেক করত। অনেক আন্তর্জাতিক সমাবেশে তিনি এমন বিচিত্র পোষাক পরে উপস্থিত হতেন যে অন্য সকলে অপ্রস্তুত। তবে যাঁরা তাঁকে ভালভাবে চিনতেন তাঁরা এতে কিছু মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন পরিচ্ছদে তাঁর বিচিত্র রুচি তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রেরই একটি প্রকাশ মাত্র।

ঠাকুর পরিবারের কেউ কেউ পোষাক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন একটি সর্বভারতীয় পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করতে যান যার মধ্যে থাকবে ধুতির লালিত্য এবং প্যান্টের কার্যকরতা। বলাই বাহুল্য এই জগাখিচুড়ি পোষাক গ্রহণযোগ্য হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের পোষাক সচেতনতার মধ্যে কোন সামাজিক মনোভাব ছিল না, বরং একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। বাঙালীরা পোষাক-আসাকে কোনরকম কেতাদুরস্ত বিধি-নিষেধ পছন্দ করেন না। এই ঘরোয়া ভাব সত্যেন্দ্রনাথ এত দূর টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি লুঙ্গি পরে জাপানে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অসঙ্কোচে হাজির হয়েছিলেন।

বাড়িতে সাধারণত তিনি পরতেন লুঙ্গি আর গেঞ্জি। বাইরে বেরোবার সময় পাজামা ও কুর্তা। শীতকালে পরতেন লম্বা কোট ও টুপী। গরমকালে অনেক সময় দেখা যেত দড়ি বাঁধা মেরজাই তাঁর দেহে।

পোষাক সম্বন্ধে আইনস্টাইনেরও অনেকটা এলোমেলো ভাব ছিল। তাঁর জীবনীকারেরা কেউ কেউ মনে করেন বাইরের প্রয়োজন কমিয়ে অন্তরের স্বাধীনতা বাড়াবার ইচ্ছাই এর আসল কারণ। লম্বা চুল রাখলে চুল কাটার দরকার করে না, মোজা একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তু। চামড়ার জ্যাকেট পরতেন আইনস্টাইন—কারণ তাতে কোট পরার ঝামেলা কমে।

বাইরের প্রয়োজন কমাবার স্পৃহা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা যায় তবে সেটা পোষাকে ততটা নয়, যতটা তাঁর জীবনযাত্রার ধরনে। বাড়ির একটিমাত্র ঘরেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এই-খানেই তিনি পড়তেন, ঘুমোতেন এবং লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

10. মাতৃভাষায় বিজ্ঞান

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে যেসব ছাত্র শিক্ষা লাভ করতেন তাঁরা সকলেই আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হত। সমাজ সচেতনতা এঁদের সকলের মধ্যেই জাগরিত হয়। এঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন দেশ গঠনের কাজে বিজ্ঞানের খুব বড় ভূমিকা আছে। কিভাবে বিজ্ঞান এই ভূমিকা পালন করবে? সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিখ্যাত সহপাঠী মেঘনাদ সাহা দুজনেই এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। তবে কোন ধোঁয়াটে আদর্শবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা। তাঁরা দুজনেই ছিলেন স্পষ্ট ধারণা ও স্পষ্ট বাক্যে বিশ্বাসী। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে চারদিকে ভ্রান্ত ধারণা দেখে দেখে সাহা অত্যন্ত অধৈর্য বোধ করতেন। সেইসব ভ্রান্ত ধারণাকারীদের কঠিন বিদ্রূপে বিদ্ধ করতেন তিনি। তাঁর 'সবই ব্যাদে আছে' (অর্থাৎ বেদে আছে) এই মনোভাব নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য সাহার মত রূঢ়ভাষী না হলেও এই 'সবই ব্যাদে আছে' মনোভাবের প্রবল সমালোচক ছিলেন। তিনি বলতেন আমাদের প্রগতির পথে এই মনোভাবই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলতেন, কিছু সহজ সত্য খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে আমাদের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে সমাধানের পথ দেখাতেন। যে জিনিসটা তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্ণধার স্থানীয়দের বোঝাতে বহুদিন

জেগে গিয়েছিল তা হল এই—যে বিজ্ঞানের গতি আমাদের দেশে ব্যাহত হওয়ার কারণ ভাষার প্রতিবন্ধকতা।

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নতির পথে এই একই প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে আছে—এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বিদেশী ভাষা ছাত্রদের পড়া মুখস্থ করাতে বাধ্য করে, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ হতে দেয় না এবং সৃজনী শক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানো হয় না, হওয়ার কোন কারণও নেই।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলিতে শিক্ষার যে অপচয় ঘটছে সত্যেন্দ্রনাথ সেই সম্বন্ধে অবহিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। এতে ছাত্রদের দোষ নেই—তাঁর মতে দোষটা শিক্ষাদান পদ্ধতির। উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষা পেলে ভারতীয় ছাত্ররা সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অর্জন করতে পারে। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের 1963 সালের সমাবর্তন উৎসবে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে এই বিষয়েই তিনি জোর দেন। গলদটা কোনখানে এবং তার প্রতিকারের পথ কি এটাই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। শিক্ষক হিসেবে তিনি শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনায় তিনি এটাই বুঝেছিলেন যে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সরাসরি ভাবের আদান-প্রদান দরকার। এই আদান-প্রদানের পথে কোন ভাষার অন্তরায় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে সমস্ত স্তরে, এমন কি স্নাতকোত্তর পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা করে দেওয়া উচিত। ইংরেজীতে সব সময় মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে ছাত্ররা নিজেদের কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এমন কি শিক্ষকও ইংরেজীতে পড়াতে হলে ছাত্র কতটা বুঝতে পারল অনুধাবন করতে পারেন না। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ থেকেই এই অসুবিধাগুলি বর্তমান

কিন্তু কখনো কোনো শিক্ষাব্রতীই এই নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মত এত সোচ্চার হননি।

পরে জাপান ভ্রমণ কালে সত্যেন্দ্রনাথের সেই দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ভাল করে দেখার সুযোগ হয়। টোকিওতে 'আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদান করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক এই আলোচনা সভায় বোস আশা করেছিলেন সব কাজকর্ম ইংরেজীতে সম্পাদিত হবে। কিন্তু তিনি শুনলেন যে যদিও সমস্ত জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরেজী ছাড়া আরো দু-একটি বিদেশী ভাষা জানেন তবু তাঁদের সমস্ত শিক্ষাদান কর্ম জাপানী ভাষাতেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথকে বেশ কিছু জাপানী শব্দ শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য অনুবাদকরা থাকবেন যাঁরা তাঁর ভাষণ তৎক্ষণাৎ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে দেবেন। এই ব্যবস্থার কার্যকরিতা দেখে সত্যেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। খুবই জটিল এবং টেকনিকাল বিষয়ের আলোচনা জাপানী ভাষায় চলল এবং শ্রোতাদের বিদেশী বক্তাদের ভাষণের জাপানী অনুবাদ শুনে বক্তব্য বুঝতে যে কিছুই অসুবিধে হয়নি সেটা পরের তীব্র বাদানুবাদ থেকেই বোঝা গেল।

সত্যেন্দ্রনাথ জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। তিনি দেখলেন সর্বত্রই আধুনিকতম ধারণাগুলি জাপানী ভাষাতেই আলোচিত হচ্ছে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে গেলেঃ[25]

"বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়। নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার করা শব্দ ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরেজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তর্জমা

হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রী হয়েছে ছয় মাসে প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ঐ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা 80 ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের সম্পর্কে।

অনেক সময় বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বিজ্ঞানচর্চায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমি বিশুদ্ধবাদী নই; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই সব শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার করা শব্দ হিসেবেই তা টিঁকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। আশা করি বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নতির সংগে সংগে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের রূপান্তর ঘটবে।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে —রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোয়েফিসিয়ান্ট, ইন্টিগ্রেশন—এসব প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক

ব্যবহার্য জিনিস। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক-ছাত্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।"

কলকাতায় ফেরার পর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার চিন্তাটি তাঁর প্রায় একমাত্র ধারণা হয়ে দাঁড়াল। ছাত্রদের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, জনসাধারণের কাছে, সভা-সমিতিতে তিনি ক্রমাগত এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। 1962 সালে তাঁর সমাবর্তন ভাষণের মূল বক্তব্যও ছিল এই। সকলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কথাগুলি শুনত, কিন্তু তাঁর ধারণা গ্রহণ করার দিকে কারো মন ছিল না।

এই প্রসঙ্গটি আসলে খুবই পুরোনো। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এর উদ্ভব। 1905 সালে যখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী 1906 সালের 16 অগাস্ট একটি কলেজ সুরু করা হল। অরবিন্দ ঘোষ হলেন সেই কলেজের অধ্যক্ষ। পরে এইটিই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা সুবোধ মল্লিক, ময়মনসিং-এর মহারাজা এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টাকায় এই শিক্ষায়তনের খরচ নির্বাহ হয়। এই তথ্যটি অনেকেরই জানা নেই যে 1891 সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাকে স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হোক এই মর্মে সেনেটে একটি প্রস্তাব আনেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

তারও আগে, 1896 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স—উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল বর্ধিত করা। সেই সময় এদেশে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ লোকেদের খুবই অনীহা ছিল। তার প্রায় ষাট বছর পরে যখন ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের শেকড় বেশ ভালভাবে গেঁথে গেছে তখন বিজ্ঞানকে আরো প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভূত হল। এ বিষয়ে সরকারী তরফে কোন প্রচেষ্টা সুরু হবার আগেই যাঁরা এ নিয়ে তৎপর হন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। 1947 সালের 18 অক্টোবর বিজ্ঞান কলেজে একটি মিটিঙে প্রস্তাব আনা হয় যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোক যার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার। এই মিটিঙে সভাপতিত্ব করেন সত্যেন্দ্রনাথ। ঐ প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ হবে ঠিক হয় এবং 1948 সালের 25 জানুয়ারী তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়। সেই উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত সার্কুলার প্রচারিত হয়ঃ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
92 আপার সার্কুলার রোড
কলকাতা-9

বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে চালিত হচ্ছে না যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে

পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এই প্রধান বাধা দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বহুল-প্রচার ও প্রসার দ্বারা তাদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।

গত 18 অক্টোবর (1947) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়, এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসেবে "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" স্থাপনা করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা।

তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশ করা।

চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা।

পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা-মূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা জেনেও আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছি এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার জন্য। সুধীবৃন্দের সহানুভূতি, সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই এই জাতীয় কর্তব্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমাদের একান্ত

বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা সবারই অকৃপণ সাহায্য পাব। বিশেষত আমরা আশা করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য, কারণ আমরা সবাই এই মহান প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। আমরা আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতা, আমরা আশা করি বিশ্বভারতীর সহানুভূতি, কারণ আমাদের প্রধান অগ্রণীর (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর) হাতেই রবীন্দ্রনাথ তুলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের বই 'বিশ্বপরিচয়।'

আমাদের সংকল্পকে রূপদান করার জন্য স্থির হয়েছে আগামী 25 জানুয়ারী, 1948 এই প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ক্রমে স্থাপন হবে। সুধীবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল সভ্য হয়ে তাঁরা যেন এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলেন।

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা (বাৎসরিক 10 টাকা) পাঠাবার স্থানঃ ডঃ সুবোধনাথ বাগচী, কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 92 আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-9।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
সুবোধনাথ বাগচী	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
জগন্নাথ গুপ্ত	পরিমল গোস্বামী
জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী	অমিয়কুমার ঘোষ
সর্বাণীসহায় গুহ সরকার	সুধাময় মুখোপাধ্যায়
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
সুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে তাঁরা প্রতি শুক্রবার মিলিত হতেন। 25 জানুয়ারী 1948-এর পরে তাঁরা মিলিত হন 30 জানুয়ারী।

সেই সময় একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেন যে গান্ধিজী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।[26]

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। পরিষদের উদ্দেশ্য পরিপূরণে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যদিও এর প্রচার এখনো পর্যন্ত মোটামুটি পণ্ডিত মহলেই সীমাবদ্ধ। পরিষদ বাংলায় পুস্তক প্রকাশও করে থাকেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ দাতাদের অর্থে এবং রাজ্য সরকারের অনুদানে পরে পরিষদের নিজস্ব ভবনও তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ এতই ছিল যে হাইড্রোডায়নামিকস প্রভৃতি পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহতম বিষয়গুলিও তিনি বাংলায় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। 1946 সালে যে ছাত্ররা এম· এসসি· ক্লাসে, তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে তিনি ক্লাসে বাংলাও বক্তৃতা দিয়ে থাকতেন। তাঁর প্রচেষ্টা অনেকেই উপহাস করতেন, মনে করতেন উচ্চ-স্তরের টেকনিকাল বিষয়গুলি বাংলায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এইসব সমালোচকদের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যখন সত্যেন্দ্রনাথ কসমোলজিতে সর্বাধুনিক ধারণার কথা বাংলায় বলেন। এইটি ছিল তাঁর সাহা স্মৃতি বক্তৃতা। এই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এতই বেশি যে ছোটখাট জায়গাতেও এজন্য তাঁর বক্তৃতা দিতে যেতে আপত্তি ছিল না।

বাংলায় তাঁর প্রথম বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ বেরোয় 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায়, 1931 সালে। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল বিজ্ঞানের সঙ্কট। যদিও তিনি লিখতেন কম তবু যা লিখেছেন তা তাঁর স্বচ্ছ ভাবধারা এবং মনোহর রচনাশৈলীর জন্য বিশিষ্ট। প্রসঙ্গত,

তিনজন দিকপাল বিজ্ঞানী—জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্র-নাথের বাংলায় বিজ্ঞান লেখার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। জগদীশচন্দ্র জটিল এবং দার্শনিক বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি উৎকৃষ্ট গদ্যরীতির নিদর্শন হিসেবে পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাহা লিখেছেন অনেক বেশি। তবে তাঁর বিজ্ঞান এবং লোকরঞ্জক বিজ্ঞান রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কতকগুলি সমস্যা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করা। তিনি রচনাশৈলীর ধার ধারতেন না। বক্তব্য ছিল তাঁর কাছে ভাষার থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু। সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর ইংরেজী লেখার সংখ্যা অবশ্যই বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। তবে যে ভাষাতেই লিখুন, সাহার ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সাদামাটা এবং স্পষ্ট। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী অনেক বেশি চলিত ভাষার কাছা-কাছি। বস্তুত তিনি যেভাবে কথা বলতেন লিখেওছেন সেই একইভাবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর বহু বক্তৃতাই হারিয়ে গেছে। তিনি কখনো তৈরি বক্তৃতা থেকে পড়তেন না এবং বক্তব্য বিষয়ের কোন নোটও রাখতেন না।

11. শেষ জীবন (1959—1974)

1957 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথকে ইমেরিটাস অধ্যাপক পদে মনোনীত করে এবং বিজ্ঞান কলেজের ঘরটি তাঁকে ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়। খয়রা অধ্যাপক হিসেবে এই ঘরখানি তিনি পেয়েছিলেন। এখন সেখানেই তাঁর অফিস হল। এখানেই তিনি আলোচনা করতেন, সেমিনার আহ্বান করতেন। শান্তিনিকেতনে যাবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বই ও পত্রিকা এই ঘরেই রেখে গিয়েছিলেন। সেই সব বই এখনো সেখানে আছে। এই ঘরটি এখন S. N. Bose Institute of Advanced Physical Studies-এর অফিস হয়েছে। যখন সত্যেন্দ্রনাথ জাতীয় অধ্যাপক হন তখন তিনি যাদবপুরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেও ইমেরিটাস অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক করেন যাদবপুরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভবনেই তাঁর অফিস ও গবেষণাগার স্থাপন করবেন। জাতীয় অধ্যাপক ও তাঁর গবেষকগোষ্ঠীর জন্য অনুদান ভারত সরকার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে পাঠাতে অনুরুদ্ধ হলেন।

মৌল কণা এবং laws of interaction সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য পরমাণু বিজ্ঞানে তাত্ত্বিক গবেষণা চালানোর ইচ্ছে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তাছাড়াও আগে জৈব রসায়নে যেসব অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন সেগুলি চালিয়ে যাবারও বাসনা ছিল। এই সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন একনিষ্ঠ

গবেষক। এঁদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে কাজ করে সবচেয়ে বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। Particle Physics-এ কাজ করতেন পূর্ণাংশুকুমার রায়। তিনি ছিলেন সিনিয়র রিসার্চ অফিসার। পরে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানে রীডার নিযুক্ত হন। ফলিত গণিত বিভাগের ঘোষ অধ্যাপক এন. আর. সেন অবসর নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষকদের দলে যোগদান করেন, কিন্তু তিনি এক বছরের মধ্যেই মারা যান। পার্থসারথি ঘোষ ও সলিল রায় ছিলেন এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ এঁরা এখানেই কাজ করে ডক্টরেট পান।

1971 সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পর অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 1954 সাল থেকে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে হিলিয়াম নিষ্কাষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম ঐ জলে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান এবং বিশ্লেষণ করার ফলে তাঁরই হাতে ঐ জলের হিলিয়াম নামক বিরল গ্যাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই গ্যাস এখন খুবই প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে মনে করা হয়। প্রস্রবণের জল আরো ভালভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ একটি পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বক্রেশ্বরে একটি গবেষণাগার তাঁরই তদারকীতে নির্মিত হয়। এখন এখানে হিলিয়াম নিষ্কাষণের কাজ প্রায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সুরু হবার মুখে।

এই সময় একটি দুর্ভাগ্যজনক পারিবারিক ঘটনা ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথের বড় জামাতা অরুণকুমার মিত্র 1958 সালে মারা যান। কিছুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই চিন্তিত থাকেতেন। ভেলোরে অবশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা বৃদ্ধ

সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল।

বছর দুয়েক পরে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা খুকুর বিবাহ হয়। স্বামীর সংগে পরে সে প্রথমে আফ্রিকা ও পরে আমেরিকা যাত্রা করে। এখন তাঁরা সেখানেই বসবাস করছেন। সেই বছরই সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস পালিত হয়। ছাত্র, অনুরাগী ও সরকারী মহল থেকে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেই বছর কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর সম্মানের জন্য বোস সংখ্যায়ন ও একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই উপলক্ষ্যে বোস সংখ্যায়নের চল্লিশ বছর নামে আলোচনা চক্র আহ্বান করে। রমেশ মজুমদার সম্পাদিত বোসন কণার উপর লেখা প্রবন্ধের একটি সংকলন তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। সেই 1924 সালের প্রবন্ধ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে কি প্রভাব বিস্তার করেছে প্রবন্ধগুলিতে তারই বিশদ ব্যাখ্যা ছিল।

মহাজাতি সদনে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, "স্বাধীনতার পর আমাদের উপর কিছু দায়িত্ব বর্তেছে। এখন শিক্ষিত সংখ্যালঘুরা একাই স্বাধীনতার ফল ভোগ কববেন না—সকলের সংগে সমান অংশীদার হবেন এটাই মনে রাখবার কথা।"

শেষ জীবনে তিনি ক্রমেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কাজকর্মের সংগে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ছিলেন।

তিনি জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন পনেরো বছর। 1974 সালে তাঁর আশি বছর পূর্ণ হল। তখন সমস্ত দেশ জুড়ে জন্মদিন উদ্‌যাপনের আয়োজন আরম্ভ হল। সেই বছরই ছিল বোস সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বছর। কলকাতায় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ডাকা হল। দেশ বিদেশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেই সভায় যোগদান করলেন। বহু বছরের

সংগ্রামের পর অবশেষে তাঁর কাজের চরিতার্থতায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। "মনে হচ্ছে আর আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই" তাঁর সেদিনের এই উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

সমস্ত জানুয়ারী মাস জুড়ে এত সভা, সম্মেলন এবং সম্বর্ধনায় যোগ দিতে হল যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে তা একটু গুরুভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি জানতেন মৃত্যু আসন্ন। তাঁর কথাবার্তায় বিদায়ের সুর শোনা যাচ্ছিল। ব্রংকিয়াল নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 4 ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

12. পরিপূর্ণতার প্রতীক

4 ফেব্রুয়ারীর ভোরবেলা সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। সেই দিন বিকেলের মধ্যেই গোয়াবাগান বয়েজ ওন লাইব্রেরীর সদস্যদের 'প্রণাম মৃত্যুহীন শিখা' লেখা ব্যাজ পরিহিত অবস্থায় দেখা গেল। বিজ্ঞান কলেজের গাড়িবারান্দায় রাখা দেহ দেখবার জন্য আবালবৃদ্ধবণিতা ভীড় করতে লাগলেন। এমনকি নব্বই অতিক্রান্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু একবার শেষ দেখা দেখবার বাসনা ব্যক্ত করায় তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দির সংলগ্ন বাসভবন থেকে বহন করে আনা হল রাজপথে। যদিও সত্যেন্দ্রনাথের বয়স যথেষ্ট হয়েছিল এবং তার মৃত্যুকে খুব একটা আকস্মিক বলা চলে না তবুও সাধারণ লোকের শোকের উচ্ছ্বাস ছিল আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিসের জন্য সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি সে বিষয়ে এইসব লোকের কোন ধারণাই ছিল না, উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের চিন্তাও অস্পষ্ট। তবু সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে জনসাধারণের গর্বের অন্ত ছিল না। সত্যেন বোস নামটি ছিল কিংবদন্তীর মত—এবং কিংবদন্তীর আড়ালের মানুষটি ছিলেন সকলের প্রিয়জন।

যে কোন বিজ্ঞানীর পেশার মধ্যেই একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কি যাদু ছিল সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে যার জোরে তিনি সেই গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বসাধারণের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সেই ধাতু

যা দিয়ে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল—এবং তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি।

মহত্বের মূল্য বড় কম নয়। মহৎ ব্যক্তি মাত্রেই সঙ্গীহীন—তাঁর খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুসংখ্যা বাড়ে, বন্ধুজনেরা অন্তর্হিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথকে এর ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। খুব অল্প বয়সে প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি—যা বিরূপভাব উৎপন্ন করার পক্ষে অনুকূল কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা কখনই তাঁর বন্ধুদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

স্কুল জীবন থেকেই দেখা গেছে বন্ধু সংগ্রহে তাঁর এক সহজাত প্রবণতা আছে। স্বভাবেই তিনি ছিলেন সামাজিক প্রকৃতির। তাঁর বন্ধুপ্রীতির কাহিনীগুলি গল্পের মত। তাঁর দু-একজন বন্ধু এখনো জীবিত আছেন তাঁর কথা বলতে গিয়ে তাঁদের গলা স্নেহে সিক্ত হয়। বন্ধুদের প্রতি তাঁর প্রীতি ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। অনেক দুঃসময়ে এতেই তিনি মানসিক বল পেয়েছেন। শেষ জীবনে লেখা বন্ধুদের চিঠিগুলি পড়লে দেখা যায় তাঁর মমতা কত গভীর ছিল, এমনকি তাঁদের প্রত্যেকটি পরিবার-পরিজনদের প্রতি।

স্কুলে পড়ার সময় তাঁর প্রিয় কবিতা ছিল টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়ম'। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে লিখিত এই কবিতা নিশ্চয় সত্যেন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করেছিল। মানুষকে ভালবাসার এই ক্ষমতা তাঁর কিন্তু সমস্ত জীবনই অক্ষুণ্ণ ছিল। জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতার স্পর্শেও এই শক্তি বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি।

এর থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত তাঁর আর একটি চরিত্রগত গুণ—মানুষকে অনায়াস বিশ্বাস। ঢাকায় যখন প্রথম অধ্যাপনা সুরু করেছেন তখন থেকেই তিনি কখনো কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করেন

নি, বিশেষ করে সে যদি কোন দুঃস্থ ছাত্র হত। তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ছাত্রদের খাওয়ার খরচ থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষার ফি দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করেছেন। কেবলমাত্র মুখের কথায় বিশ্বাস করে ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ দিয়েছেন—দুবার ভেবে দেখেননি। বহু দান করেছেন তিনি অন্যের অগোচরে—সেসব কথা দাতা ছাড়া কেউ জানেও না। নিজের প্রয়োজনের কথা তিনি একবারও ভেবে দেখতেন না। বলাই বাহুল্য তাঁর বিশ্বাসের অবমাননাও ঘটেছে, কিন্তু তাতে তাঁর দানের ক্ষেত্রে কোন ইতর বিশেষ ঘটত না। 1946 সালের দাঙ্গার সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে মোটা রকম অর্থ ধার চায়। সে বলে ঐ টাকা দিয়ে সে বেতার যন্ত্র তৈরি করবে। পূর্ব পাকিস্তানের কোন সংবাদ তখন এদিকে আসছিল না। লোকটি প্রস্তাব করে এই-ভাবে সে উভয় বাংলার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের চেষ্টা করবে। সত্যেন্দ্রনাথ সদ্য ঢাকা ছেড়ে এসেছেন। সেখানে বহু বন্ধু ও প্রিয়-জন রয়ে গেছেন যাঁদের খবর না পেয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত। তিনি অবিলম্বে তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। সেই টাকার কিন্তু কোন হিসাব আর পরে পাওয়া যায়নি। সহজেই তাঁকে প্রতারণা করা যেত, এমনই ছিল তাঁর স্বভাব। তখনকার দিনে অধ্যাপকের বেতন কিছু কম ছিল না এবং তিনি 1922 সাল থেকে অধ্যাপনা করে এসেছেন তবু মৃত্যুর পরে দেখা গেল তাঁর সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছুই নেই। মৃত্যুর পর একটি প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে এই মন্তব্য করা হয়।

‘অনেকে এই ভেবে ক্ষোভ করতে পারেন যে তিনি নিজের ধারণা-গুলি বিন্যস্ত করার কাজে আরো মনোযোগ কেন দিলেন না। তা করলে তিনি হয়ত আরো উচ্চদরের বিজ্ঞানী বলে গণ্য হতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি তাঁর উজ্জ্বল মনীষা নিয়ে

কেবল এদিক ওদিক করেই কাটিয়ে দিলেন।[26]-ক

উঁচুদরের বিজ্ঞানী হবার জন্য অথবা আরো সম্মান লাভের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ পরিশ্রম করছেন এই চিত্র তাঁর চরিত্রের সঙ্গে কোনমতেই খাপ খায় না। যখন খ্যাতি এসেছিল তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। সমালোচকরা যখন ঠাট্টা করে বলত, কবে তিনি নোবেল পুরস্কারটা পাচ্ছেন তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলতেন 'আমার যা পাবার আমি পেয়ে গেছি।' এছাড়া অন্য কিছু করা তাঁর পক্ষে স্বভাববিরুদ্ধ হত, তবে এর দ্বারা তিনি নিজের প্রতি অবিচার করলেন কিনা সেটাই স্বতন্ত্র কথা।

সবকিছু সম্বন্ধেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত নিরুৎসুক। ইউরোপে বহুকাল আটক থাকার পর যখন দেবেন্দ্রমোহন বসু দেশে ফিরলেন তখন সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সাহা এসেই তৎক্ষণাৎ গবেষণার প্ল্যান সম্বন্ধে উত্তেজিত-ভাবে আলোচনা সুরু করে দিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করলেন, 'এখানে কিছু রিসার্চ করা হবে মনে হচ্ছে।' এই ঘটনা থেকেই তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হবে।

তবে অনেক সময় এর জন্য ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে। মাদাম কুরীর সঙ্গে প্যারিসে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হল এইরকম একটি উদাহরণ। মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম ব্ল্যানপীড সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি ভুল সিদ্ধান্তে পেঁছিন। তাঁর ধারণা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মনে ইউরোপীয়দের প্রতি ভীতি ছিল। ব্ল্যানপীড এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে দুটি উদাহরণ দেনঃ

"যদিও তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন প্যারিসে লাজভাঁর সঙ্গে আছেন

এবং লাজভা তখন ডি ব্রগলির থীসিস নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে পত্রালাপে রত। বোস তাঁকে একবারও বলেননি যে আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করা তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তিনি যদি মাদাম কুরীকে জানাতেন যে তাঁর ফরাসী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে তাহলে মাদাম কুরী হয়ত তাঁকে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট করে নিয়ে নিতেন। কিন্তু বোস হয় অত্যধিক বিনয়বশে কিম্বা হয় তাঁর (মাদাম কুরীর) ইংরেজী বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে ফরাসীতে কথা বলতে সাহস করেন নি।"[27]

সম্ভবত এই লেখকের জানা ছিল না যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বরাবরই অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। কখনই তিনি নিজের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাইতেন না। এমনকি স্কুলে পড়ার সময়ও তাঁর প্রকৃতি এই রকমই ছিল। সাধারণত বালকদের মধ্যে একটু আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনী প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতির বালক ছিলেন না। কোন বন্ধুকে ডাকতে গেলে তিনি নীরবে তাদের বাড়ির ফটকের সামনে অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ না বাড়ির কাউকে সেই পথে আসতে দেখা যেত। তিনি কখনই গেটের কাছ থেকে চীৎকার করে নাম ধরে ডাকতেন না। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই এইরকম যার প্রকৃতি সে মাদাম কুরীর মত মহিলাকে থামিয়ে বলবে, যে তিনি ভুল করছেন—এটা ভাবাই যায় না।

বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরেও কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নাম প্রচারে ছিলেন আগের মতই নির্বিকার। অহংকার অথবা গর্বের স্থানও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর বাল্যবন্ধু গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 1924 সালে প্যারিসে ছিলেন। একদিন সকালে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে দেখেন তিনি কতকগুলি জার্মান রিপ্রিন্টের উপর

চোখ বোলাচ্ছেন। গিরিজাপতি সেগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তাঁর বন্ধু অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে বললেন এগুলি তাঁর প্রবন্ধের একশটি রি-প্রিন্ট, আইনস্টাইনের কাছ থেকে এসেছে। গিরিজাপতি শুনে আনন্দে, উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হলেন। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে সেগুলি সরিয়ে রেখে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন চলো, এবার খেতে যাওয়া যাক। সেদিন অবশ্য গিরিজাপতিই বন্ধুকে খাইয়েছিলেন।

তবে বাইরেটা যতই নির্বিকার হোক সত্যেন্দ্রনাথের ভিতরে ছিল দৃঢ়তা ও শক্তি; যদিও তার প্রকাশ খুব কম সময়েই দেখা গেছে। তাঁর ভাগিনেয় ভক্তপ্রসাদ মিত্র এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কোন আত্মীয়ের মৃত্যুশয্যায় সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। বাড়ির সকলে তখন শোকে বিহ্বল। সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ় হস্তে পরিস্থিতি পরিচালনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হিসেবে যে অল্প সময় তিনি ছিলেন তার মধ্যেই তাঁর দৃঢ় মনোবলের ও নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। শাসন কাজে সাফল্য লাভের জন্য যে ধরনের চাতুর্যের প্রয়োজন সেটা তাঁর ছিল না। তিনি চাপের কাছে কখনো নতি স্বীকার করতেন না। এমন কি আশুতোষের মত প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছেও তিনি মাথা উঁচু রাখবার সাহস করেছিলেন।

দেবেন্দ্রমোহন বসু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল অফ সায়েন্সের-এর একটি মিটিঙের উল্লেখ করেছেন। সেই মিটিঙে স্যার আশুতোষ ফলিত গণিত বিভাগে আরো কিছু নতুন শিক্ষণীয় বিষয় যোগ করার প্রস্তাব করেন।

"ফলিত গণিত বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। শিক্ষকদের তুলনায় পাঠক্রম গুরুভার হয়ে যাবে বলে তিনি একাই

প্রস্তাবের তুমুল বিরোধিতা করেন। স্যার আশুতোষের কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক খাচ্ছেন তিনি—আমরা রুদ্ধশ্বাসে ডেভিড ও গলিয়াথের এই সংঘর্ষ দেখছি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যে অবিচল। তবে গলিয়াথ দৈত্য হলেও বিশাল হৃদয়, তিনি বুঝতে পারলেন যে সাহস করে তাঁর মতের বিরোধিতা করছে তার কিছু বলার আছে।"

সাধারণ মাপকাঠিতে কোন মতেই তাঁর মত ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করা চলে না। তিনি ছিলেন সব বিষয়েই ব্যতিক্রম। অসাধারণ ব্যক্তিরা কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে চলেন না—এরকম একটা কথা আছে। সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রে যা দুর্জ্ঞেয়, এমনকি নিজের মনীষা তিনি অপচয় করছেন বলে যে ভ্রম হয় আসলে তার সবই তাঁর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে। আজকাল বিশেষজ্ঞদের যুগ। এখন কোনো বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব এলাকা (সব সময়েই তা অতি সংকীর্ণ) ছেড়ে অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাবেন এটা অন্যায় বলে মনে করা হয়। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাঁরা সেই যুগের প্রতিভূ যে যুগে পরিপূর্ণতাই ছিল আদর্শ, যখন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে মনে করা হত স্বাভাবিক। সত্যেন্দ্রনাথের যুগের নাম করা ব্যক্তিরা কেউ সেইরকম সংকীর্ণমনা বিশেষজ্ঞ ছিলেন না যেমন আজকাল ভূরি ভূরি দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরা ছিলেন সাহিত্য ও কলাবিদ্যাতেও সমান উৎসাহী। সেই যুগের আদর্শ ছিল মানুষকে সম্পূর্ণতার দিকে চালিত করা, কোনো একটি বিশেষ পরিধির মধ্যে আটকে রেখে বিশেষজ্ঞ উৎপন্ন করা নয়। দেবেন্দ্রমোহন বসুকে এর একটি উদাহরণ ধরা যেতে পারে। তিনি সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন, তাঁর মাতুল জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ

ছিল ঘনিষ্ঠ। পদার্থবিদ্যা ছাড়াও তিনি গেটে, ইবসেন এবং শীলারের চর্চা করেছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁর ভালভাবে পড়া ছিল। তাঁর পদার্থবিজ্ঞানে যেমন ব্যুৎপত্তি ছিল, তেমনি ছিল ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যে।

মেঘনাদ সাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের চেষ্টায় বড় হন। কিন্তু তাঁর মানসিক গঠনেও ঐ একই পরিপূর্ণতার আদর্শ সক্রিয় ছিল। তিনি সর্বদাই বিজ্ঞানের জগৎকে অতিক্রম করে চলে গেছেন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নদীবিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায়। কেবল মাত্র তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় পঞ্চাঙ্গ পুনর্বিন্যস্ত হয়। স্বাধীনতার পরে উন্নয়ন, পরিকল্পনা, নদী-প্রকল্প ইত্যাদি যেসব কাজে হাত দেওয়া হয় তার অনেকগুলিরই প্রধান স্থপতি ছিলেন তিনি। শেষ দিকে তিনি যখন লোকসভার নির্বাচনে নামলেন তখন অনেকেই বিজ্ঞানীকে রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হতে দেখে ক্ষুণ্ণ হন। সাহা তাদের বলেনঃ[28]

"অনেক সময় অনুযোগ করা হয় যে বিজ্ঞানীদের কাজ তাঁদের গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাইরের জগতে কি ঘটছে না ঘটছে তাতে অংশ নিতে তাঁরা বিমুখ। সমাজের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ বা সাহায্য আসে না। বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি আমি আমার জীবনের অনেকটা অংশই দেশ ও জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেস ও অন্যদল-গুলি দেশের আর্থিক সামাজিক দুর্গতি দূর করার বিষয়গুলি ভেবে দেখার সুযোগ পায় নি। কিন্তু এগুলি আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা—যদি আমরা সমস্ত নাগরিকের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরীর সুব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের

কণ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন।"

শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে, তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, কৃষিযোগ্য জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সাহা অবিশ্রান্ত লিখে গেছেন।

সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহার জীবনের একটি আশ্চর্য মিল আছে। সাহাও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ 'তাপ আয়ননতত্ত্ব' করেন খুব অল্প বয়সে। সাহার পূর্ব-পরিচিত এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বক্রকটাক্ষ সহকারে বলেছিলেন, এ আর এমন নতুন আবিষ্কার কি—এ সবই তো বেদে আছে। এই আক্রমণের যোগ্য উত্তর দিয়ে সাহা কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে বহু বছর ধরে দুই বন্ধুর মধ্যে এই প্রবন্ধটি নিয়ে ঠাট্টা তামাসা হত। "সবই ব্যাদে আছে" কথাটির উল্লেখ সত্যেন্দ্রনাথের কথায় ও লেখায় পাওয়া যায়।

তবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে এঁদের যা প্রতিক্রিয়া হত তার প্রকৃতি থেকে দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য ভালভাবেই বুঝতে পারা যায়। 1932 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিচয় পত্রিকাগোষ্ঠীর একটি আড্ডায় ভারতীয় যোগী ও ইউরোপীয় অধ্যাত্মবাদীদের সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে প্রবোধ বাগচী বলেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ভারতীয় ঋষিদের কাছে অজানা ছিল না। এইখানে সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। বরং গিরিজাপতি ভট্টাচার্য উত্তেজিত হয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিলেন।

যতই সামাজিক ও বন্ধুবৎসল হোন, সত্যেন্দ্রনাথ একদিক দিয়ে ছিলেন চূড়ান্ত রোম্যান্টিক। তিনি কাজ করতেন প্রেরণার আকস্মিক ঝলকে—দীর্ঘ পরিশ্রম ও প্রস্তুতি করে অথবা দলগতভাবে পরিকল্পনা করে এগোতেন না। এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন

চরিত্রের যে বিজ্ঞানীটির কথা সহজেই মনে আসে তিনি আধুনিক কালের হোমী জাহাঙ্গীর ভাবা। পূর্বেই বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ব্যক্তিকে ঘিরে গবেষণা থেকে কিভাবে গোষ্ঠীগত গবেষণার যুগ এসেছে। স্বভাবের দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যক্তি প্রাধান্যের যুগের বাসিন্দা। কিন্তু কুরীদের দিন এখন গত, এখন বিজ্ঞানকে একা প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয় না। টেকনোলজির অগ্রগতি এখন গবেষণার গতি প্রকৃতি আমূল বদলে দিয়েছে। ভাবা সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট ছিলেন। ভারতে পরমাণু শক্তির বিরাট পরিকল্পনার ছক তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁর। তিনিই এই পরিকল্পনা রূপায়নের ভার নিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। এই জাতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা বা সংগঠন সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না—তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী। এটাই ছিল তাঁর মহত্ব এবং এতেই ছিল তাঁর সীমাবদ্ধতা।

এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে, যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর খ্যাতির শীর্ষে পোঁছেছেন তখন উচ্চাশী যুবকেরা সকলেই চাইতেন তাঁর সঙ্গ। তাঁর সঙ্গে কোনভাবে নিজের নাম যুক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন সকলেই। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত বিচিত্রার আসরগুলিতে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু তনি কখনোই এগিয়ে এসে পরিচয় করার চেষ্টা করেন নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের তাঁকে চেনার কোন সুযোগই হয়নি। 1925—26 সালে যখন জার্মানীতে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় তখন তরুণ বিজ্ঞানী বোস সম্বন্ধে আইনস্টাইন জানতে চান। বোসকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন না। কোনো কোনো জীবনীকার[29] এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কারণ সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও

ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা কি কখনো সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেননি? এই ঘটনাতে আর কিছু না হোক সত্যেন্দ্রনাথের চরিত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সমসাময়িক কালের বিবরণে হিরণকুমার সান্ন্যাল লিখেছেনঃ[30]

"শেষ জীবনে যখন তিনি আর হাঁটতে পারতেন না, আড্ডা জমত তাঁর বাড়িতেই প্রতি শনিবার বিকেলে চা ও ঘুগ্নির সঙ্গে। বাড়ির তৈরি অপূর্ব ঘুগ্নি। এ আড্ডাকে সাহিত্যিক আড্ডা নিশ্চয় বলা চলে এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক আড্ডা, কেননা এমন বিষয় নাই যা নিয়ে এখানে আলোচনা হত না, আর এ-সব বিষয়ে সত্যেনবাবুর মন্তব্য শুনলে মনে হত উনি বিজ্ঞান ছাড়া সব বিষয়েই পারদর্শী, কেননা বিজ্ঞান নিয়ে তর্কাতর্কি হত খুব কমই।"

নিজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এই যে অনীহা, সন্দেহ হয় এর পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ছাড়া আরো কিছু ছিল। সেই সময়কার আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রতি ঠিক অপ্রসন্ন না হলে খুব একটা আগ্রহীও ছিল না। ভারতে বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেছে এক শতাব্দীরও কম। যা কিছু সম্মান এবং যশ ছিল সাহিত্য ও কবিতার প্রাপ্য। জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্র থাকা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নব-জাগরণের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। অথচ কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞান জগতে সে কি উদ্দীপনা। সাহার তাপ-আয়ননতত্ত্ব জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে দশটি প্রধান আবিষ্কারের মধ্যে একটি বলে গণ্য হয়েছে। জগদীশচন্দ্র নোবেল পুরস্কার অল্পের জন্য হারালেন। সি· ভি· রামন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার লিখিত ইতিহাস বা বিবরণে

এইসব ঘটনাবলী যে জনমানসে কোনো দাগ কেটেছিল তার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। 'সবই ব্যাদে আছে' এই মনোভাব তখনো অব্যাহত। আপেক্ষিকবাদ ভারতীয় ঋষিরা জানতেন এই জাতীয় ধারণা শিক্ষিতদের মধ্যেও প্রচলিত। স্পষ্টই দেখা যায় বিজ্ঞান এমনকি বুদ্ধিমানদের মনেও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—তাদের কল্পনা উদ্দীপ্ত করা তো দূরের কথা।

সত্যেন্দ্রনাথকে কোনো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। তাঁর সময় দিয়ে হয়ত তাঁকে খানিকটা বোঝা যায় কিন্তু পুরোটা নয়। তাঁর বহু বিস্তৃত মনীষা বুঝতে গেলে তেমনই মনীষা প্রয়োজন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর বাংলাভাষার উৎস ও ইতিহাস নামক বৃহৎ গ্রন্থটির ফাইল কপি তাঁকে দেখান তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেগুলি পরে ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা নিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে[31] সত্যেন্দ্রনাথ যেমন অনায়াসে আলোচনা চালাতে পারতেন তেমনি বিদ্রোহপূর্ব ফ্রান্সের অবস্থা নিয়ে অথবা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস মূল ফরাসীতে পড়ে সেই নিয়ে ভাব বিনিময় করতে পারতেন। আটাত্তর বছর বয়সে তিনি ফরাসী গল্পের সুন্দর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সকলকে আশ্চর্য করেন। এতজনকে তিনি এত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন যে তাঁর এইসব পরোক্ষ কাজের কথা হয়ত কোনদিনই জানা যাবে না। কেবল কৃতজ্ঞ ছাত্র ও সহকর্মীরা গভীর বিষাদের সঙ্গে অনুভব করছেন যে এমন গুরুর সন্ধান কোনো দেশে কোনো কালেই মেলা বিরল, যিনি নিজের কোন সুনাম হবে না জেনেও পরিশ্রম করে অন্যকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হতেন না। একজন কৃতী বিজ্ঞানী সব সময়েই নিজের কাজের প্রচার নিয়ে বিব্রত থাকেন, কিন্তু তাঁর

থেকেও উচ্চে সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী, সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেন। সেগুলি বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। মাত্র 1958 সালে তিনি F. R. S হন। নানাবিধ জাতীয় সম্মান অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পরে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর পর যে তরুণ বিজ্ঞানীদল এগিয়ে আসবেন তাঁরা এই ভেবে আশ্চর্য হবেন যে এঁকে কেন নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা হল। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বিরাট জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং তিনি হয়ত উত্তর দিতে হলে সেই প্রথম যুগের সমালোচকদের স্তব্ধ করা ভাষায় বলতেন, "আমার যা পাবার আমি পেয়ে গেছি।"

নির্দেশিকা

1. P. K. KABIR; *Physics Teacher,* খণ্ড 16, সংখ্যা 2 (1974) পৃঃ 85
2. M. G. K. MENON: *Physics News,* খণ্ড 5, সংখ্যা 2 (1974) পৃঃ 89
3. ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সের গঠনতন্ত্র।
4. J. D. BERNAL; *The Social Function of Science,* (1969), Penguin.
5. NEMAI SADHAN BOSE; *The Indian Awakening And Bengal* (1964) পৃঃ 242, Firma K. L. Mukopadhyay, Calcutta.
6. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডার (1956); প্রেসিডেন্সি কলেজ।
7. প্রফুল্লচন্দ্র রায়; আত্মজীবনী।
8. নীরেন্দ্রনাথ রায়; 'অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি' (1964) পৃঃ 32
9. সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি; 'অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি' (1964) পৃঃ 21
10. ডি· এম· বসু; 'অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি' (1964) পৃঃ 14
11. রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়; বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস (1964) শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, কলকাতা
12. বি· ডি· নাগচৌধুরী; আকাশবাণী, খণ্ড 39. সংখ্যা 11 (এপ্রিল 1974) পৃঃ 235.

13. অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের চিঠি—অধ্যাপক অজিতকুমার সাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
14. P. K. RAY; *Physics News,* খণ্ড 5. সংখ্যা 2 (1974), পৃঃ 47
15. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা চিঠি থেকে—অধ্যাপক অজিতকুমার সাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
16. সতীশরঞ্জন খাস্তগীর; অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি (1964) পৃঃ 44
17. সত্যেন্দ্রনাথ বোস; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 'পদার্থবিদ্যা ও গণিত' শাখায় 1929 সালে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।
18. সত্যেন্দ্রনাথ বোস; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের একত্রিশতম অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণ (1944)
18ক. E. C. G. SUDARSHAN; *Science Today,* জানুয়ারী 1974, পৃঃ 34
19ক. *Visvabharati News*: জুলাই 1956
19খ. *Visvabharati News*: অগাস্ট 1956
20. ASIMA CHATTERJEE; *Science and Culture,* খণ্ড 40, সংখ্যা 7 (1974) পৃঃ 295
21. বি· এম· উদগাঁওকরঃ আকাশবাণী, খণ্ড 39, সংখ্যা 11 (এপ্রিল 1974) পৃঃ 534.
21ক. বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরীঃ আকাশবাণী, (এপ্রিল 1974), পৃঃ 536
22. অন্নদাশঙ্কর রায়: অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি (1964) পৃঃ 26.
23. GAGANBEHARI BANDOPADHYAY; *Physics News,* খণ্ড 5, সংখ্যা 2 (1974) পৃঃ 58.
24. S. N. SEN; *Science and Culture,* খণ্ড 40, সংখ্যা 7 (1974) পৃঃ 271
25. সত্যেন্দ্রনাথ বোস; বিজ্ঞানের সঙ্কট (1964) পৃঃ 79, লেখক সমবায় সমিতি. কলকাতা।
26. পরিমল গোস্বামী; দ্বিতীয় স্মৃতি (1962) গ্রন্থপ্রকাশ,

কলকাতা পৃঃ 57
26ক. স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় (1974) কলকাতা।
27. W. A. BLAMPIED; *American Journal of Physics,* খণ্ড 40, সংখ্যা 9 (1972) পৃঃ 1212
28. মেঘনাদ সাহা; অপ্রকাশিত রচনা থেকে—অধ্যাপক অজিত-কুমার সাহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।
29. অমিয়কুমার মজুমদার; দেশ, সাহিত্য সংখ্যা (1974) পৃঃ 131.
30. হিরণকুমার সান্ন্যাল; দেশ, সাহিত্য সংখ্যা (1974) পৃঃ 87.
31. সহায়রাম বসু; অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সপ্ততিতম জন্মদিবস-শ্রদ্ধাঞ্জলি (1964) পৃঃ 25.

পরিশিষ্ট—1

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের বৈজ্ঞানিক রচনার নির্বাচিত তালিকা

1. On the influence of the finite volume of Molecules on the equation of State, *Phil. Mag.*, **36,** 1918, 199 with M. N. Saha.
2. The Stress-equations of Equilibrium, *Bull. Cal. Math. Soc.*, **10**, 1919, 117.
3. On the Horpolhode, *Bull. Cal. Math. Soc.* **11,** 1919, 21.
4. On the equation of State, *Phil. Mag. Sr.* **6,** 39, 1920, 456 with Meghnad Saha.
5. On the deduction of Rydberg's law from the quantum theory of Spectral Emission, *Phil. Mag.*, **49,** 1920, 619.
6. Plancksgesetz und Lichtquantenhypothese, *Zeits. fuer Physik,* Bd **26,** 1924, 178.
7. Waermegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie, *Zeits. fuer Physik,* Bd. **27,** 1924, 385.
8. On the complete moment-coefficients of the D'-statistics, Sankhya : *The Indian Journal of Statistics,* **2,** 1936, 385.

9. On the moment coefficients of the D^2-statistics and certain integral and differential equations connected with the multivariate normal population, Sankhya : *The Indian Journal of Statistics,* **3,** 1937, 105.
10. Recent progress in Nuclear Physics, *Science and Culture,* **2,** 1937, 473.
11. Anomalous Dielectric Constant of Artificial Ionosphere, *Science and Culture,* **3,** 1937, 335 with S. R. Khastgir.
12. On the total Reflection of Electromagnetic waves in the Ionosphere, *Ind. Jour. Phys.* **12,** 1938, 121.
13. Studies in Lorentz Group, *Bull. Cal. Math. Soc.,* **31,** 1939, 137.
14. The complete solution of the Equation :

$$\nabla^2\phi - \frac{\delta^2\phi}{c^2\delta t^2} - K^2\phi = -4\pi\rho\,(xyzt)$$

Proc. Nat. Inst. Sc., India, **7,** 1941, 93 with S. C. Kar.
15. Reaction of sulphonazides with Pyridine : Salts and Derivatives of Pyridine-imine, *Science and Culture,* **8,** 1943, 48 with P. K. Dutta.
16. A note on Dirac equations and the Zeeman effect, *Ind. Jour. Phys.* **17,** 1943, 302 with K. Basu.
17. On an integral equation associated with the equation for hydrogen atom, *Bull. Cal. Math. Soc.* **37,** 1945, 51.
18. Extraction of Germanium from Sphalerite collected from Nepal, Part II, *Jour. Sci. Indust. Res.* 9B, 1950. 271.
19. Les identities de divergence dans la nouvelle theorie

unitaire, *Comptes rendus des Seances de la Academic des Sciences;* t. **236**, 1953, 1333.

20. Une theorie du champ unitaire avec $\Gamma\mu = 0$ *Le Jour. de physique et la Radium,* t. **14**, 1953, 641.
21. Certaines consequences de l'existence du tenseur **g** dans le champ affine relativiste. *Le Jour. de physique et la Radium.* t. **14**, 1953, 645.
22. The affine connection in Einstein's new Unitary, field theory, *Annals of Math.* **59**, 1954, 171.
23. A report on the study of Thermoluminescence, Dr. D. M. Bose Seventieth Birthday Commemoration Volume: Tran. Bose Res. Inst. **20**, 1955, 177.
24. Solution d'une equation tensorielle intervant dans theorie du champ unitaire, *Bull. Soc. Math.* France **83**, 1955, 81.

পরিশিষ্ট—2

সত্যেন্দ্রনাথ বোসের রচনা

(ক) বিজ্ঞানের সঙ্কট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের একটা নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে। এ যুগের বিশেষত্ব কি, তা আলোচনা করবার আগে, বিজ্ঞানের ক্রমিক পরিণতির বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

নিউটন থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অত্যুক্তি হবে না। তার আগেও আমরা বস্তুজগতের বিষয় অনেক জিনিস খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে জানতাম। যে জ্ঞান আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কাজে আসে, শিল্প বাণিজ্যে যে জ্ঞান মানুষের সুবিধা ও সম্পদের জন্য কার্যকরী হতে পারে এমন অনেক জ্ঞান প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তখন শুদ্ধ বিজ্ঞানের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল একমাত্র গণিতশাস্ত্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রিয় বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও তাঁদের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা যে নিয়ম ও সত্যানুসন্ধানের যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজ্ঞানিকরা জড় জগতের অন্যান্য বিষয়গুলিকে নিজেদের আয়ত্ত আনবার চেষ্টায় সেই রীতি ও নিয়মসমূহই বরণ করেছিলেন। ইউক্লিড তাই এখনও পর্যন্ত সকল দেশেই পূজা ও সম্মান পাচ্ছেন। গণিত শাস্ত্রের নিয়মকানুন

যে জড়পদার্থের গতিবিধিতে লাগান যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দেখালেন। চোখের সামনে যে বিভিন্ন জড়পদার্থের সমাবেশ দেখছি, তাদের পরস্পরের ব্যবধান এবং তাদের গতির পরিমাণ ও লক্ষ্য জানা থাকলে, ভবিষ্যতে আবার তাদের কি রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে, তা আগে থেকে নির্দেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজ্ঞানের অনুসন্ধান।

এই গণনা করতে নিউটনই আমাদের শেখালেন। তার পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে অনুসরণ করে দেখালেন যে, আকাশের তারকা থেকে আরম্ভ করে আমাদের পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছোট বড় সব জিনিসের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটে এবং গণনার ফলাফল ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য সত্যই প্রত্যক্ষভাবে মেলে। আকাশের কোন্‌খানে দু' বৎসর বাদে কোন্ গ্রহের উদয় হবে, তা আজকে আঁক কষে বলা যায়। আবার কামানের গোলা ছুঁড়লে, শত্রুব্যূহের মধ্যে কোথায় গিয়ে পড়বে, তাও গণিতশাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা জড়পদার্থের অন্যান্য গুণাগুণের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ এসব কিছুই বাদ গেল না। নিউটনের পদানুসরণে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা এই সকল প্রসঙ্গের অনুসন্ধানে প্রায় একই রকম রীতির অনুবর্তন করেছেন এবং অনেকাংশে কৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে আবার প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জড়পদার্থের গঠন ও উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। এই বৈচিত্র্যময় জগতের আদি উপাদান নিরূপণ করার জন্য অতি আদিম কাল থেকেই মানব মন ব্যগ্র ছিল। বহু দিনের অনুসন্ধানের ফলে আজ রসায়নশাস্ত্র বলতে সক্ষম হয়েছে যে, বিরানব্বইটি আদি ধাতুর বিভিন্ন সংমিশ্রণেই আমাদের নিকট প্রতীয়মান সর্বপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি।

কাঠ পাথর থেকে আরম্ভ করে প্রাণিদেহের উপাদানসমূহ সবই ঐ আদি বস্তুগুলির সংমিশ্রণে জাত। প্রমাণস্বরূপ রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে রোজ রোজ নতুন নতুন জিনিস তৈরি করে দেখাচ্ছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যেসব জিনিস জন্মায়—কি খনির মধ্যে, কি জীবদেহে—মানব চক্ষের অন্তরালে প্রকৃতির যেসমস্ত জিনিস তৈরি করে, তাদের উৎপত্তি আগে রহস্যময় বলে মনে হত। আজ সেগুলির বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সকলেরই মূলে কেবল সেই কয়টি আদি ধাতুই আছে, এবং অনেক স্থলেই মৌলিক বস্তুর পুনঃসংমিশ্রণে সেই সব জিনিস নিজের পরীক্ষাগারে তৈরি করতে মানুষ সক্ষম হয়েছে। এই বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণের নিয়ম খুঁজতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদে উপনীত হয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এটি যে, দৃশ্যত কঠিন, তরল বা বায়বীয় সকল পদার্থই আদিতে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, পদার্থের কাঠিন্য, তারল্য ও বায়ুস্বভাব মূলত পরমাণুদের গতি ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলাফল। এই সিদ্ধান্তে নিঃসংশয়ভাবে উপনীত হবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের দেখতে হল, যে নিয়মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদের গতিবিধি চলেছে, সেই নিয়ম ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের পক্ষেও খাটে কিনা (রাসায়নিক বিরানব্বইটি আদি বস্তুর আবিষ্কার করেছে সে কথা আগেই বলেছি)। ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে, টমসন, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ বিরানব্বইটি আদি বস্তুও আবার দুইটি মৌলিক উপাদানে গঠিত। আর একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ প্রোটন, আর একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা অর্থাৎ ইলেকট্রন। প্রত্যেক রকম পরমাণুরই মূল উপকরণ এই দুইটি। যে বিশ্লেষণে রাসায়নিকরা দেখিয়েছিলেন যে, বিভিন্ন রকমের জড়পদার্থের মূলে

বিরানব্বইটি আদ্য ধাতু বর্তমান, প্রায় সেই রকম বিশ্লেষণ করেই আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন যে, আদি বস্তুর পরমাণুর মূলে ঐ দুইটি বিদ্যুতাণুর কল্পনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রতীয়মান জগতে ওই দুই প্রকারের বিদ্যুৎকণার পরস্পর সংযোজন ও সংমিশ্রণে যত রকম বিভিন্নধর্মী পদার্থের উদ্ভব হয়েছে, সেই যোজন মিশ্রণের নিয়ম আবিষ্করণই আজকের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাদার-ফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে অনুমান করলেন যে, সৌর জগৎ যেমন সূর্যকে ভারকেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষায় বিভিন্নভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রহরাজির সমাবেশ গঠিত, প্রত্যেক পরমাণুর গঠনরীতিও তদ্রূপ। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যস্থানে বা নাভীতে একটি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি বিদ্যমান, যার গঠনের মধ্যে ধনাত্মক কণার সংখ্যাই বেশী। এরি চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষায় ঋণা-ত্মক বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে। কেন্দ্রের ধনাত্মক বিদ্যুতের যে পরমাণু বহিঃকক্ষায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ সমষ্টির পরিমাণও তাই। সমগ্র অণুটি তাই আমাদের স্থূল পরীক্ষায় বিদ্যুৎহীন বলেই প্রতীয়-মান হয়। প্রত্যেক কণার বিদ্যুতের পরিমাণ একই, কাজেই আগে যে বিরানব্বইটি আদি বস্তুর কথা বলেছি, তাদের পরমাণু গঠনের তারতম্য বহিঃকক্ষার ইলেকট্রন সংখ্যার উপর নির্ভর করছে। সর্বাপেক্ষা গুরু ধাতুর মধ্যে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন বিরাজমান। রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অনেক কারণ দেখিয়েছেন এবং এই গঠনপ্রণালীর ফলে যে আদি বস্তুর অনেক ধর্মেরই উদ্ভব হয়েছে তার বহু সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিদ্যুৎ ও জড়পদার্থের নিবিড় সম্বন্ধ আজকাল আমাদের কাছে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি নিয়মে ইলেকট্রন ধনাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারিদিকে ঘোরে, সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা আজও সম্পূর্ণরূপে ঘোচেনি।

উত্তাপ ও আলোকের বিষয় অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিকরা আবার কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা আমাদের এ স্থলে জানা দরকার। বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানচক্ষুতে যখন দৃশ্যত ঘন কঠিন বস্তুও মূলে কয়েকটি গতিশীল অণুর সমষ্টি বলে প্রতীয়মান হ'ল, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই চিরচঞ্চল অণু-রাশির ঘাত-প্রতিঘাতে ও তাদের গতিই সমস্ত উত্তাপ ও অন্যান্য সহাবস্থায় কারণস্বরূপ ধরতে হবে। আগুনের মধ্যে একটি ধাতু যষ্ঠির একপ্রান্তে রাখলে আগুনের বাহিরে অন্য দিকও সে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, এর কারণ তাঁদের মতে অনেকটা এই, অগ্নি-কুণ্ডের জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতর অণুর সংঘাতে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত শীতল ধাতুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অণুগুলির গতি আরও চঞ্চল হয়ে উঠে, সেই চাঞ্চল্যের বেগ ক্রমশ ঘাত-প্রতিঘাতে বাহিরের দিকে সংক্রামিত হয়। উত্তাপের পরিমাণ বস্তু অণুদের চাঞ্চল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উত্তাপভেদ বস্তুর যে আস্থাভেদ হয়, তা শুধু অণুদের গতির তারতম্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মসমূহ এই ক্ষেত্রে খাটান যায় কিনা, সে বিষয়েও আলোচনা সুরু হল এবং তাতে তাঁরা কতকটা কৃতকার্যও হলেন। এখানে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে নিউটন গতিবিজ্ঞান যেরকম করে নক্ষত্রের বিষয়ে লাগান গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে সে নিয়মগুলিকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের বিষয়ে লাগানো একরূপ অসম্ভব। আমরা দেখেছি যে, গ্রহ ও জড় বস্তুর অবস্থানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে গণনার জন্যে সেই বস্তু-

গুলির উপস্থিত সন্নিবেশ ও গতিবিধি জানা দরকার। কিন্তু অণু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অসম্ভব। তবুও, তা সত্ত্বেও গতিবিজ্ঞান যে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারে বলে আমরা মনে করে থাকি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি মূলত এই—বহু কোটি সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টি নিয়ে স্থূল জড়পদার্থ। জড়পদার্থের গুণাগুণ বিবেচনা করতে গেলে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অণুটির অবস্থানের সঠিক খবর জানা বিশেষ দরকার হয়, সাধারণ কয়েকটির আচরণ আমরা গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকেই বলতে পারি, অনেক সময় উত্তাপ বিজ্ঞানের পক্ষে এইটুকু যথেষ্ট। যেমন একটি দেশে—যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস—প্রত্যেক লোকের জীবনের গতিবিধি সূক্ষ্মভাবে না জেনেও দেশের আর্থিক হিতাহিত ও জন্মমৃত্যুর গড়পড়তা হারের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায় যেটা সাধারণত নির্ভর করে সে দেশের জলবায়ুর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। এই জ্ঞান যেমন অনেক সময়েই অনেক বিষয়ে আমাদের কাজে লাগে এবং সে সকল বিষয়ে আমরা যেমন একটা হিসাব নিকাশ খাড়া করতে পারি, অণুসমষ্টির গতি-বিধির নিয়মের গণনাও অনেকটা সেই রকম।

নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম, জ্যামিতি অথবা অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মকানুনের মত অমোঘ, এই বিশ্বাসের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহ ও স্থূল জড়ের বিষয়ে সেই নিয়ম খাটিয়েছিলেন। গণনার সহিত ঘটনার সামঞ্জস্য থেকে বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথম ধারণা জন্মেছিল যে, প্রত্যেক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নিয়মের ঐ রকম অনতিক্রমনীয় ও অটল হবে। কিন্তু উত্তাপ বিজ্ঞানের নিয়মের বিষয়ে যে সে নিশ্চয়তা খাটে না, তা আগেকার কয়েকটা কথা থেকেই বোঝা যায়। পরমাণু অতিক্রম করে আজ যখন বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি হিসাবে সমস্ত জড় জগৎকে দেখতে চাচ্ছেন, তখন এটা বোঝা শক্ত

হবে না যে, আজ তাঁরা বিদ্যুতের আদি ধর্ম থেকে যেসব জাগতিক নিয়মে, গণিতের সূত্র অনুসারে উপনীত হচ্ছেন সেগুলিকে আর জ্যামিতিক নিয়মের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসান সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী কতকগুলি নিয়ম রূপেই সে-গুলিকে দেখতে হবে। জ্যামিতিক নিয়ম পদার্থবিজ্ঞানের অনেক-গুলি নিয়মের মধ্যে তফাতের কথা আরো বলার ইচ্ছা রহিল।

ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল সূক্ষ্মশরীর পরমাণুদের রঙ্গস্থল আকাশক্ষেত্র। প্রথমে পরমাণুদের ধারণা ছিল যে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমরা ভাবতে পারি, অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরো ছোট প্রোটীন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও আকৃতি আমরা সেইরূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অণুতে অণুতে কিংবা প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকার বিভিন্ন বৈদ্যুতিক অংশের ব্যবধান এই ফলস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-গুলির আকৃতির এবং আয়তনের অনুপাতে অনেক অধিক। জগৎ বিচ্ছিন্ন কণাসমষ্টি তাদের মধ্যে ব্যবধান ও দূরত্ব এত বেশী যে, জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্থরিক্ত আকাশক্ষেত্রের কথা মনে পড়ে। অথচ আলোকের ধর্ম অনুশীলন করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে, আলোকে এই আকাশপথে বহমান তরঙ্গ বিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্রের অনেক সমস্যার সদুত্তর মিলে যায়। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছে ঈথার নামে একটা বিচ্ছেদহীন অনন্ত পদার্থ। পরমাণু বা বিদ্যুৎকণা সেই ঈথার সমুদ্রে ভাসমান। আলোকরশ্মি এই ঈথার সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। এই সমুদ্রে ছোট-বড় নানারকমের ঢেউ উঠতে পারে এবং সকল ঢেউ রিক্ত আকাশক্ষেত্রে সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আলোর

বর্ণভেদের কারণ ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের তারতম্য। যেসকল ঢেউ-এর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় আলোকজ্ঞান উৎপাদন করে, তাদের চেয়েও অনেক বড় ও অনেক ছোট ঢেউ আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহস্যের অনেকটা আজকাল মানুষের আয়ত্তে এসেছে। আজ আকাশ পথে যে বেতারে নিমেষের মধ্যে এক স্থান থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে মানুষের খবরাখবর যাচ্ছে, সেই কার্যে বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ। এগুলি আলোকের ঢেউ-এর চেয়ে অনেক বড়। পক্ষান্তরে যে রঞ্জনরশ্মি আজকাল রোগনিদানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিও ওই ঈথারের তরঙ্গমাত্র, তবে সেগুলি আলোর ঢেউ-এর তুলনায় অনেক ছোট।

এক পরমাণু ও অপর পরমাণুর মধ্যে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা ও পৃথিবীর মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান থাকলেও ঈথার সকলকে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করে রেখেছে। ঈথার তরঙ্গেই আমাদের কাছে চন্দ্র তারা নীহারিকা থেকে আলো আসছে। এই পথেই আমরা সূর্যের কাছ থেকে উত্তাপ ও আলো পাচ্ছি। পৃথিবী যে আজ জীবনের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত, সে শক্তির বিকাশ ও অপচয় আজ আমরা মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে দেখছি, সে সমস্তেরই মূলে হচ্ছে ঈথার পথে আনীত সূর্যের কিরণরাশি। আলোক তরঙ্গে আনীত শক্তিকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জড়পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরে রাখছে এবং কল্পনাতীত অতীত থেকেই এই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত আছে। ঈথার তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ও প্রোটন-ইলেকট্রনের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণই যে জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মী জড়ের বিকাশ হচ্ছে ও তার লীলাখেলা চলছে, এইটা আজকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল কথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে

বৈজ্ঞানিক এই ঘাত-প্রতিঘাতে ও আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মূল সূত্র-গুলির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

পূর্বে সংক্ষেপে বিজ্ঞানের যে ক্রমোন্নতির ও বিকাশের কথা বলেছি তা' নিউটন থেকে আরম্ভ করে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মানব-প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই নিউটনের অনুসরণ করে গণিতকারেরা গতিবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্যগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্যা-গুলিকেও প্রায় সবই ওই গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন; ফলে তাঁদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি গতিবিজ্ঞানের অনুরূপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিক্রম হতে পারে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সমস্যার যে দু-একটির উত্তর তখনো মেলেনি, তার জন্য তাঁদের গণনার অক্ষমতাই দায়ী নিয়মগুলি কিন্তু সর্বকাল ও সর্ব-বিষয়েই প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই জন্যেই তাঁরা পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মত ধ্রুব মনে করতেন এবং ভাবতেন, নিয়ম-মাত্রেই ওই একই পর্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশ যখন পরমাণুবাদ ও ইলেকট্রনবাদ উদ্ভব হল, যখন উত্তাপ বিজ্ঞানের নিয়মসমূহ আগেকার নিয়মকানুন থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের বলে তাঁরা দেখতে পেলেন। তখন ওই নিয়মগুলির যথার্থ কি, সে বিষয় চিন্তা করতে সুরু করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করে, এইসব কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল। আলোকবিজ্ঞানের চর্চা করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উভয় সংকটে এসে পড়লেন। অন্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে যেসব নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ

ছিলেন আলোকশাস্ত্রে সেগুলিকে লাগাতে গিয়ে তাঁরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সেগুলি পরীক্ষার ভুল বলে সাব্যস্ত হল। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিউটনের গতিবিজ্ঞান অনুসারে আলোকতরঙ্গের সহিত পরমাণুদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, অঙ্ক কষে, তাঁরা যা ঠিক করেছিলেন, পরীক্ষায় তার বিপরীত দেখা গেল। ফলে 1900 সালে প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত quantum theory বা শক্তি-কণাবাদের অবতারণা করলেন। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ব্যাপারটি এই। যদিও আলোক-বিজ্ঞানের আগেকার পরীক্ষাগুলি আলোকের তরঙ্গবাদের পক্ষে অনুকূল ছিল, প্লাঙ্ক দেখালেন, যখন আলোকের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যার ফলে পরমাণু আলোকতরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা যার ফলে আলোক সৃষ্টিকালে পরমাণুর কার্যশক্তি ঈথারে অর্পিত হয়, তখন আর তরঙ্গবাদের দ্বারা আসল ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ করা যায় না। আলোকপথে বহমান শক্তির প্রবাহকে কেবল তরঙ্গবাদের দ্বারাই সমগ্র ও নিঃসংশয়ভাবে বোঝা গেলেও, পরমাণু ও আলোক-রশ্মির মধ্যে যখন শক্তির আদান-প্রদান ঘটে, তখনকার সমস্যার সদুত্তর আর তরঙ্গবাদে পাওয়া যায় না। এই সময়ে বরং আলোক শক্তিকণার সমষ্টি, এই ভাবের একটি কল্পনা দরকার হয়।

যেমন রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ ও বিশ্লেষণ কথা আলোচনা করতে গিয়ে, জড়ের পরমাণুবাদের কল্পনা আমাদের করতে হয়েছিল, আলোকের উৎপত্তি ও আলোকরশ্মি থেকে জড়পদার্থের শক্তি আকর্ষণের ধর্ম বিচার করতে গিয়ে তেমনি আলোককণাবাদে উপস্থিত হতে হল। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোককণার সমষ্টি, এইটিই quantum theory-র মূল কথা। আলোকের স্পন্দন সংখ্যার উপরেই প্রত্যেক বর্ণের আলোককণার

অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে, এবং জড়ের পরমাণু কিংবা ইলেকট্রন যখন আলোক থেকে শক্তি আহরণ করে তখন আলোক থেকে এই একটি আলোককণার তিরোধান ঘটে। পক্ষান্তরে, জড়পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে শক্তি অর্জন করে, এক-একটি আলোক-কণা উদ্ভূত হয়। এই ভাবের কল্পনা নিউটনের গতিবিজ্ঞানের একেবারে পরিপন্থী। নীলস বোর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা গত কয়েক বৎসর চেষ্টা করছেন, কি করে এই আলোককণাবাদের সহিত পূর্বযুগের বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমন্বয় সাধিত হবে।

আলোকবিজ্ঞানের উভয় সংকটের কথা মূলত এই—আলোকের প্রবাহের বিচার করতে গিয়ে যেসব প্রশ্ন উঠে, সেগুলির সমাধান তরঙ্গবাদেই মিলে, এখানে কণাবাদ অচল। পক্ষান্তরে আলোকের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কণাবাদই এক্ষেত্রে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর সুচারুরূপে দিতে সমর্থ। তরঙ্গবাদ এখানে মোটেই চলে না। গত চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার বিদ্যুৎকণার বিষয়ে কতকগুলি নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, তার মানে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রনকে যদিচ আমরা স্বল্পায়তন কণারূপে কল্পনা করে আসছিলুম, তবু টমসন, গারমার প্রমুখ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, সময় বিশেষে ইলেকট্রনের স্রোতকে তরঙ্গধর্মী বলে মনে হয়। আলোকতরঙ্গ যেমন সময় বিশেষে বিচ্ছুরিত হয়ে বর্ণছত্রের সৃষ্টি করে, ইলেকট্রনের স্রোত অনেক সময় সেইরূপভাবে জড়পদার্থের উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়।

এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জড়কণা ও আলোকতরঙ্গকে আর আগেকার মতো কল্পনা করা চলবে না। যাকে এতদিন

অল্পায়তন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা বলে ভেবে আসা হচ্ছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে, তার মধ্যে বিস্তৃত তরঙ্গের প্রকৃতিও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, আলোকতরঙ্গকে ঢেউ সমষ্টি বলে কল্পনা করলে ভুল হবে, কারণ অনেক সময় সেটি ঠিক জড়ের মত কণাসমষ্টিরূপেই ফলোৎপাদন করে।

এই বিপ্লবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও তাদের উচ্চাসন অটল রাখতে পারছে না। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম যে পরমাণুর রাজ্যে অচল তার প্রচুর প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এত বড় ইমারৎ খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করার ন্যায়সংগত প্রয়াস, সে বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। সংগে সংগে ব্যবধান ও সময় নির্দেশ সম্বন্ধেও গবেষণা হচ্ছে। ব্যবধান, গতি ও সময়ের পরিমাণ এই মাপজোপের উপরেই গতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমরা যখন সেগুলির মাপজোপ করি, তখন কি এক প্রচ্ছন্ন জিনিসকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই, তারও অনুসন্ধান চলছে। বলতে গেলে এটা বিজ্ঞানের আত্ম-পরীক্ষার যুগ। সাফল্যের উন্মাদনায় নিত্যনতুন আবিষ্কারের লালসায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসমস্ত জিনিসকে বিশেষ বিচার না করেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, এখন বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করছেন সেগুলির সংগে ভালো করে বোঝাপড়া করতে।

[পরিচয়, ১৩৩৮]

(খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ—(1973)

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সমারোহে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করার আমন্ত্রণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এদিকে বয়স আশীর কোঠায় পেঁৗছেছে, শরীর অপটু; মনও তার সাবলীল স্বচ্ছন্দতা হারাতে বসেছে, তাই একটু সংকোচ জেগেছে, কি বলবো? এই সুধীজনের আসরে চারিদিকে জীবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত নবীনদের মুখ দেখছি—এঁরা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসে অধ্যয়ন শেষ করেছেন—অনুসন্ধানে যশস্বী হয়েছেন, নতুন আলোকপাত করেছেন জড়ের ও জীবের নানা সমস্যার উপর। তাই এখন বেশী করে মনে পড়ছে পুরাণো কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমি একদিন ছাড়পত্র নিয়ে বের হয়েছিলাম। পরে জীবনের এই দীর্ঘপথে নানা বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মনে জমেছে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা—তাতে আছে পরাজয়ের দৈন্য, জয়ের আনন্দ—মহাপুরুষের সংসর্গ ও বিশেষ করে পরাধীনতার গ্লানি মুছে স্বাধীন জাতির পংক্তিতে বসতে পাওয়ার অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদ। হয়ত পুরোগামী বর্ষীয়ানের অভিজ্ঞতা থেকে নবীন যাত্রীরা কিছু পথ চলার সংকেত পেতে পারেন—এই ভরসায় বলতে সুরু করলাম।

স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয়নি—এলো দেশে স্বদেশীয়ানার জোয়ার। কিশোর বয়সে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি—রাখীবন্ধনের গান গেয়ে অনুভব করতে চেয়েছি ভাই ভাই আমরা সকলে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই ভারতমাতার সন্তান। দীন ভারত-মাতার দুঃখ দূর করতে হবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙগতে হবে—বিদেশীর নিষ্করুণ আসন ও শোষণনীতি থেকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে পুরাতন ঐতিহ্যসম্পন্ন একটা মহাজাতিকে। তাঁদের সেকেলের বংশধরদের মধ্যে বর্তমানের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে—নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। সেদিনের যুবকেরা ভবিতব্যের চ্যালেঞ্জ এইভাবে বুঝেছিল।• সেদিন রাস্তায় রাস্তায় সভা-সমিতিতে কত বাগ্মী দেশভক্ত মহাপুরুষেরা বক্তৃতা করতেন দেশবাসী যুবক-দের উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। সেসব গল্প করতে ইচ্ছা হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে জায়গা পেলাম। চিরস্মরণীয় দেশমান্য শিক্ষকদের কাছে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে তাঁর বেতার ঢেউয়ের আবিষ্কারের কথা শুনেছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়নে হাতেখড়ি হয়েছে। প্রোঃ পার্সিভ্যালের কাছে ইংরেজী পড়ার অসামান্য সুযোগ পেয়েছিলাম। এসব কথা এখনো বলতে গর্ববোধ করি।

কলেজের ছয় বৎসর শেষ করার আগেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

স্বদেশী আন্দোলনে ডেকে এনেছিল সর্বত্র বিদেশী শোষকের অত্যা-চার। ফলে খোলা রাজনীতি তলিয়ে গিয়ে বিপ্লবের যুগ ডেকে আনলো বাংলা-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্র সর্বত্র। কত মহাপ্রাণ দেশের জন্য আত্মবলি দিলেন। সহযাত্রী কত দেশবিদেশে চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়লো। জীবনের দীর্ঘ পথে কত বন্ধুকে কতভাবে

হারিয়েছিলাম। কতজন সর্বস্ব পণ করেছিল আদর্শের মান বজায় রাখতে—অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছিল দেশমাতৃকার পরাধীনতা দূর করতে। আজ স্বাধীনতার দিনে তাঁদের মনে পড়া স্বাভাবিক।

স্যার আশুতোষ চেয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় নব-বিজ্ঞান মন্দির গড়ে তুলতে—সেখানে পূজারী তন্ত্রধার সবই হবে ভারতীয়। বিদেশী শাসকদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্থের অভাব হল না—দাতারা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। কৃতজ্ঞ মুগ্ধ দেশবাসী তাঁদের মর্মর মূর্তি কলেজের দ্বারপথে বসিয়ে রেখেছে। স্নাতকোত্তর ক্লাস খোলা হল নতুন কলেজে। বিশেষ করে প্রথমেই রসায়নের ব্যবস্থা হল। প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে হাল ধরলেন পালিত প্রফেসর হয়ে। চিরকুমার সাধক ইনি কলেজের একটি ঘরে অবসর সময়েও রয়ে গেলেন। কাছে জুটে গেল অনেক নবীন ছাত্র—তাঁকে ঘিরে থাকতো, সেবা করত অষ্টপ্রহর।

যুদ্ধের মধ্যে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও স্যার আশুতোষ রাজী হলেন আমাদের মত কয়েকজন যুবককে নিয়ে ফিজিক্স স্নাতকত্তোর ক্লাস খুলতে। পরে অবশ্য সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে সি· ভি· রামন এসে হাল ধরলেন। আরও নবীন উৎসাহে ছেলেরা অনুসন্ধানে মেতে উঠল। ইতিহাসের পাতায় উঠলো বিজ্ঞান কলেজের নানা অবদান। প্রোঃ রামন নোবেল প্রাইজ পেলেন এই কলকাতা থেকেই। ইতিমধ্যেই তাঁর সহকর্মীরা আরও অনেক যশস্বী হয়েছেন—কেতাবে উঠেছে তাঁদের গবেষণার কথা।

স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বলিষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠলো রসায়ন, জীববিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সর্বশাস্ত্রে। তখনো বিদেশী শাসকের হাতে শাসনদণ্ড রয়েছে। তবু ভবিষ্যতের আহ্বানে বিশ্ব প্রতিযোগিতার অঙ্গনে

নেমে পড়েছে তরুণেরা, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁরা এগিয়ে চলতে পেরেছিল, জয়মাল্য পরিয়েছিল দেশমাতৃকার কণ্ঠে। তাঁদের আদর্শবাদ ও তাঁদের আত্মবিশ্বাস তাঁদের বুদ্ধিমত্তার ও কর্মনৈপুণ্যে আশুতোষ বিশ্বাস করতেন। তারাও যথাসাধ্য নিজেদের বিশ্বাসের উপযুক্ত আধার বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এইসব কথা অবান্তর তবে আজকের দিনে নানা প্রতিকূল ঘটনার সংঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছবি কিছু নিষ্প্রভ ঠেকছে তবুও আমি আশাবাদী বলে পুরণো কথার প্রগলভতার মধ্য দিয়ে এইটুকু বলতে চাচ্ছি, দক্ষ পরিচালনা করে ছাত্রদের মধ্যে আদর্শের কথা জাগিয়ে তুলতে পারলে তারাও আবার আগের মতই সর্বস্ব পণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

এসব প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। পরে নিয়তির আবর্তে ভেসে গেলাম ঢাকায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য কমিশন বসেছিল। দেশবিদেশ থেকে কত সুধী অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে ছিলেন। বহু সাক্ষ্যসাবুদ সমালোচনার পর বিস্তৃতভাবে উচ্চ-শিক্ষা এদেশে প্রবর্তন করার যে ছক তৈরি হয়েছিল তারই নির্দেশ যথাসাধ্য মেনে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো নানা প্রদেশে। কলকাতা অবশ্য তা মানলো না। তারই অনুসরণে ঢাকায় এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হলো। আমরা কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন ডাক পেলাম—সেখানে নতুনভাবে শিক্ষাধারাকে প্রবর্তন করতে।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গান্ধীজী আসরে নেমে নন-কোঅপারেশনের ডাক দিয়েছেন। মেধাবী ছাত্রের কেউ কেউ গবেষণার পথ ছেড়ে চরকা হাতে দেশ সংগঠনে নেমে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও সে

ঢেউ উঠেছিল—কিন্তু তাতে স্থায়ী কোন পরিবর্তন আনলে না।

বিদেশী শাসক ইতিমধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির বিষ বপন করেছেন। রাজনীতিতে দেশের নায়কদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। স্বদেশীর যুগে হিন্দু, মুসলমান, খৃীস্টান—এসবই এক ভারতমাতার সন্তান। পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এই ছিল সাধনার মূলনীতি। পরে এলো খিলাফৎ মুসলমানদের ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন। শাসকেরা নিপুণ হস্তে সেটায় ভেদনীতির প্রধান অস্ত্র যোগান দিলো।

ঢাকায় পঁচিশ বৎসর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। বারবার দেখা গেছে রাজনৈতিক নায়কের আকর্ষণ ও প্রভাব দরদী শিক্ষকের থেকে অনেক বেশী। তবুও সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষকের কৃত্য করে যেতে হয়েছিল প্রতিদিন। তবে আজ বাংলাদেশে যা ঘটছে তাতে মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অধ্যাপনা একেবারে নিষ্ফল হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান মরে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে—সেখানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শাসন চলবে এই আশার কথা শুনেছি। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও চলেছে। নানা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে উঠবে তা কিছু সময় না গেলে বোঝা দুষ্কর।

কলকাতায় ফিরে এলাম পঁচিশ বৎসর পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। এদিকে Cripps মিশন ফিরে গেছে। Direct action-এর হুমকি শোনা যাচ্ছে। এক বৎসর পরেই বিরাট খুনো-খুনি শুরু হলো। শেষ অবধি এলো স্বাধীনতা—বাঙ্গালী এর জন্য স্বপ্ন দেখেছিল। এর জন্য তার দেশও দুভাগ হয়েছে আর কত লক্ষ পরিবার উদ্বাস্তু সর্বহারা হয়েছে বাংলা ও পাঞ্জাবে।

স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গালী অনেক কিছু বিসর্জন দিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়নি। এমন অনেকে আছেন হয়ত আমার শ্রোতাদের মধ্যে লোকস্থানের কথায়—পূর্ববঙ্গের ছেলেবেলাকার পরিবেশ ও ঘরদুয়ারের কথা মনে পড়বে ও ঠেলে উঠবে একটা নির্বাক ক্রন্দন। তবু আমার মনে হয় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে একবার হিসাব-নিকেশের কথা ভাবলে মন্দ হয় না। হয়ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আগে করলে সেটা আমাদের কাজে আসতে পারে। কেউ কেউ হয়ত বলে বসবেন বাঙ্গালীর লাভ-লোকসানের হিসেব বড় সেকেলে শোনাচ্ছে কানে যখন বিশ্বমানব প্রীতির কাছে জাতীয়তাবাদই নরম সুরে গাইতে হয়। কোন বন্ধুর হয়ত মনে পড়বে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতির সঙ্গে এই মতের সমর্থন করে ডিগ্রী পেয়েছেন এক বিদ্বান—"পুরাকালে ভারত বলে কোন দেশসত্ত্বার কল্পনা এখানকার লোকেদের মনে উঠতো না, ইংরাজ আসাতে তবে এটা গজিয়ে উঠেছে।" আশি বৎসরে এসে স্বীকার করছি যে এখনো সেকেলে রয়ে গেছি বলেই বাঙ্গালীকে মনে হয় আপনার জন: তার সুখ-দুঃখের কথা মনের অনেকটা ভরে থাকে।

স্বাধীনতার এই পঁচিশ বৎসরে বাঙ্গালী হারিয়েছে অনেক। দেশ-বিদেশে তার প্রতিষ্ঠা ছিল। লোকে তার বিদ্যার জ্ঞানের কদর করতো। আজকাল নানা প্রদেশের যে বিরোধী মনোভাব জেগে উঠেছে তা নিয়ে আমরা কি করব? ভাবতে হয়, আবার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক হারিয়েছি। সেকালে বিজ্ঞান শিখতে আমরা ছুটেছিলাম যাতে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ে, ব্যবসা গড়ে উঠে। নতুন নতুন এইসব ভাবতাম। আর ভাবতাম ঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন পি· সি· রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করে। স্বদেশী যুগের প্রথমে যেসব কলকারখানা খোলা হয়েছিল তার প্রায় সবই একে

একে বন্ধ হতে বসেছে, নয় অন্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। বাঙালীর গর্ব করার মত বাঙালী প্রতিষ্ঠান বলে যা বলা যায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিরক্ষরতা দূরের কাজে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারে আমরা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছি।

দেশের সব যুবকের উপর এক মস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছে—নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেটা ভেবে দেখতে। কিভাবে আবার বাঙালীকে তার পুরাণো আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই জন্য সচেষ্ট হতে দেশের যুবকদের অনুরোধ করে এই বক্তৃতার উপসংহার করলাম।

16 জুন, 1973 **সত্যেন বোস**

কলকাতা